
জানুয়ারী ১৯৭৩
পৌষ ১৩৭৯
GUM



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ,স্ক্যান ও এডিট ঃ কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পঃ বঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত

রোশনাই

জানুয়ারী ১৯৭৩
পৌষ ১৩৭৯

প্রচ্ছদ
শৈল চক্রবর্তী

অলঙ্করণ ও অন্যান্য ছবি
সুব্রত ত্রিপাঠী
সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদিকা
গীতা দত্ত

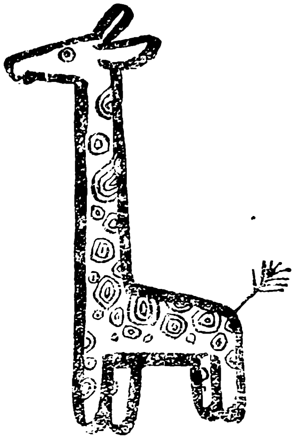
এশিয়া মুদ্রণী কলিকাতা বারো হতে ছেপে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা বারো থেকে প্রকাশ করছেন মৃণাল দত্ত

॥ ছড়া ও কবিতা ॥

॥ উপন্যাস ॥

॥ **গল্প** ॥

॥ **প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা** ॥



নিয়ম-কানুন

'রোশনাই' শিশু ও কিশোরদের মাসিক পত্রিকা। প্রতি ইংরাজী মাসের এক তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা—আশি পয়সা। বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নয় টাকা। নমুনা সংখ্যার জন্য আশি পয়সার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

আশ্বিন [সেপ্টেম্বর] মাস থেকে 'রোশনাই'-এর বর্ষ শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।

লেখা নকল রেখে পরিষ্কার করে নাম ঠিকানাসহ কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাতে হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো কোনমতেই সম্ভব নয়। গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা ও ছবির সঙ্গে গ্রাহক সংখ্যা, বয়স ও ঠিকানার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

পত্রিকা না পেলে চলতি মাসের মধ্যে স্থানীয় ডাকঘরের মতামতসহ জানাতে হবে। চিঠিতে সব সময় গ্রাহক সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হয়।

চিঠিপত্র, টাকা-পয়সা, লেখা ও খবরাখবর পাঠাবার ঠিকানা ঃ রোশনাই, এ ১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-বারো। ফোন ঃ ৩৪-২৩৮৬।



রোশনাই

একটি কিশোর মাসিক

১৩শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা
পৌষ ১৩৭৯/জানুয়ারী ১৯৭৩

ছড়া

সমীর সেন

বাংলা ভুলে গেছে মাধব বিলেত থেকে ফিরে
নাচছে শুধু তাধিং তাধিং
বলছে মুখে 'নাথিং নাথিং'
আত্মীয়জন কান্নাকাটি করছে তাকে ঘিরে।

হাওয়াই জাহাজ চড়ে এল মস্ত কবিরাজ
ভরি দুয়েক নস্যি নিয়ে
তাকালো সে চোখ পাকিয়ে
নাড়ি টিপে রইলো বসে, পড়ল মুখে ভাঁজ।

বললে শেষে পড়শীজনে, কান্নাকাটি ছাড়
রোগীর মাথা বরফ জলে
ডুবিয়ে রাখ সুকৌশলে
তাহার পরে হাজার চারেক গাঁট্টা ওকে মার।

পড়শীজনে শাস্ত্রমতে ওষুধ দিল ঠেসে
ইয়া বড় মস্ত জোয়ান
ঘামছে বসে চার পালোয়ান;
হাজার চারেক গাঁট্টা খেয়ে সারল অসুখ শেষে।

॥ একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

গ্রহের অবস্থান

প্রভঞ্জন রায়



॥ সাত ॥

পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত মহাকাশযাত্রীদের সঙ্গে আল্ট্রামাইক্রোওয়েভ বেতারে আমাদের যোগাযোগ ছিল। তাদের কাছ থেকে শেষ যে খবর পাওয়া গিয়েছিল তাতে বোঝা গেল যে, ধূমকেতুর আকর্ষণ এড়াবার জন্য ওরা উল্টোমুখে সোজা গিয়ে, নেপচুনের কক্ষপথ পার হয়ে গতিপথ বদল করে 'ক্রুগার ৬০' তারাটার দিকে রওনা হচ্ছে আর সেখান থেকেই সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। শেষের দিকে আবহ খুবই খারাপ হয়ে পড়াতে ভাল করে খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। এর অল্প পর থেকেই ওদের সঙ্গে বেতার সংযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আর ওদের সম্বন্ধে নতুন কোনো খবরই পাবার আশা নেই। ওদের ভবিষ্যৎ একমাত্র ভগবানই জানেন।

এতকাল আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলো থেকে বেতারে সব খবরই পাওয়া যাচ্ছিল। টেলিভিসনের পর্দায় ধূমকেতুটার আর শনিগ্রহের ছবি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ধূমকেতু যতই আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, টেলিভিসনের পর্দার ছবি মাঝে মাঝে ততই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল আর বেতারেও থেকে থেকে বেশ গোলমাল হচ্ছিল। ধূমকেতুর জন্যই যে আমাদের বায়ুমণ্ডলের বাইরে আইয়োনোস্ফিয়ারে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেছে, সেটা বোঝা গেল। ঐ গণ্ডগোল আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা গেল, যখন নজরে পড়ল যে কম্পাসের কাঁটা সব সময়ে উত্তরমুখী থাকছে না, প্রায়ই ডাইনে বাঁয়ে নড়ে যাচ্ছে।

শনির সঙ্গে সংঘর্ষের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, আমাদের মানমন্দিরে ভিড় ততই বাড়তে লাগল। সবারই এক উদ্দেশ্য—সংঘর্ষের ফলাফল দেখা। চোখের সামনে একটা গ্রহের ধ্বংস মানুষের জ্ঞানে এর আগে কখনও হয় নি। সেজন্য সংঘর্ষের কিছু আগে থেকেই একটানা ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে এই প্রলয়ের পরেও মানুষ যদি বেঁচে থাকে, তাহলে পরবর্তী যুগের লোকেরাও এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী নিজেদের চোখে দেখতে পায়।

আমি সমস্তক্ষণই মানমন্দিরে কাটাচ্ছিলাম, সেজন্য সংঘর্ষটা নিজের চোখে দেখা ভাগ্যে ছিল। ভাষায় তার সবটা প্রকাশ করা যায় না। ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছি মাত্র। ধূমকেতুটা প্রথমে শনির বলয় ভেঙে ফেলল, তারপর সোজা গিয়ে শনিকে ঘা দিল। দুটোই ঐ প্রচণ্ড আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে, সোজা আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। মানমন্দিরের বাইরের লোকেরা প্রথম দিকে সমস্ত ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু এই সংঘর্ষের কিছু আগে থেকেই এক এক সময় পর্দাটা একেবারে ঝাপসা হয়ে পড়ছিল। তার ফলে পর্দার ছবি এত অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এই সময় যদিও বাইরের লোকদের সবারই চোখ আকাশের দিকে, তবু

কিছুদিন থেকেই ধূমকেতুর আভায় আশে পাশে কোনো গ্রহ বা তারা খসলে চোখে দেখা যাচ্ছিল না। সেজন্য বাইরের লোকেরা ঠিক কখন সংঘর্ষ হ'ল তা বুঝতে পারে নি। তবে সংঘর্ষের কিছু আগে থেকেই মানমন্দির থেকে বেতারে ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছিল, যাতে কখন কি ঘটছে তার সঠিক খবর সকলেই পান।

দিন দুই পরে শুধু চোখেই দেখা গেল যে, ধূমকেতুর মাথায় ঐ উজ্জ্বল তারার মতো জায়গাটা অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে আর বেশ ম্লান হয়ে গেছে। খবরের কাগজের সাবধান বাণী যে মনগড়া কথা নয়, সেটা এতদিনে সকলেই ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। এই সংঘর্ষের ছবি দিয়ে খবরের কাগজে নতুন করে প্রবন্ধ ছাপা হ'ল। তার সঙ্গে আবার সকলকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান করিয়ে দেওয়া হ'ল।

নতুন হিসাবে দেখা গেল যে ঐ ভাঙা টুকরোগুলো পৃথিবী থেকে প্রায় সত্তর লক্ষ মাইল দূর দিয়ে যাবে, কিন্তু ছোটখাটো অনেক টুকরোই পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে ওগুলো পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে পৃথিবীতে এসে পড়বে। এগুলোর বেশির ভাগই অবশ্য আমাদের বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কয়েকটা টুকরো পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে। এ জন্য ঐ সময়টাতে রাতের বেলা খুব উল্কা বৃষ্টি নজরে পড়বে।

যত দিন যেতে লাগল ধূমকেতু আর শনির ভাঙা গোলাকার পিণ্ডটা ততই বড় আর উজ্জ্বল হতে লাগল। ধূমকেতুর লেজটার কোনো চিহ্নই আর এখন নজরে পড়ছিল না। এই বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা আর মত বিরোধের অন্ত নেই। এঁদের এই কাণ্ড দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগতো। কোথায় পৃথিবী এমন প্রলয়ের মুখে চলেছে এই নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। যত মাতামাতি আর বৈজ্ঞানিক কচকচি ঐ হারানো লেজটা নিয়ে। বৈজ্ঞানিকরা যে সত্যিই অন্য জগতের মানুষ, সেটা আজ খুব ভাল করেই বুঝতে পারলাম।

সূর্যগোলকের প্রায় আড়াই গুণ বড় একটা নতুন গোলক এখন রোজ পুব আকাশে উদয় হচ্ছে আর পশ্চিম আকাশে ডুবছে, তবে দু'দিনের উদয়ের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার তফাত নেই। আজকাল একবার উদয়ের কুড়ি ঘণ্টা পরেই আবার উদয় হচ্ছে। এই গোলকটা যত কাছে আসবে, ততই এই সময়ের ব্যবধান কমে আসবে। হিসাব করে পাওয়া গেছে যে যখন ওটা আমাদের সব থেকে কাছে আসবে, তখন এই ব্যবধান বারো ঘণ্টায় দাঁড়াবে আর গোলকটাকে সূর্যগোলকের প্রায় ছয়গুণ বড় দেখাবে।

এরই মধ্যেই আবহমণ্ডল বেশ বদলিয়ে গেছে। যদিও এখন শীতকাল আর সাধারণতঃ শীতকালে এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। এবার শীতের কোনো লক্ষণই ছিল না, বরং মাঝে মাঝে বেশ গরম হাওয়া বইছিল। মাথার ওপর সে ঘন নীল আকাশ আর নজরে পড়ে না, মনে হচ্ছে চারদিক যেন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। এ সবই যে ঐ নতুন আগন্তুকের উপদ্রব তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সাধারণ

লোকেরা এই সব কারণে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। অনেক সময়ই সব কাজ কর্ম বন্ধ রেখে তারা হতভম্ব চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো।



আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো

সব থেকে আশ্চর্যের কথা হ'ল যে, এই সময় থেকেই উত্তর আকাশে কুয়াশাজালের পিছন থেকে মাঝে মাঝে অরোরা বোরিয়ালিসের মতন বর্ণালী আলোকচ্ছটা দেখা যেতে লাগল। এত উত্তরে কখনও এ সব দেখা যায় না। বোঝা গেল এর মূলেও রয়েছে আইয়োনোস্ফিয়ারের গণ্ডগোল। কম্পাসের কাঁটা দেখে এখন আর উত্তর দিক ঠিক করা যাচ্ছিল না। সেটা পাগলের মতন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল।

রাত্রের বেতারে খবর পাওয়া গেল যে, জাপানে দু'দুবার ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। টেলিভিসনের পর্দায় দেখা গেল যে, সমুদ্র থেকে জলোচ্ছ্বাস উঠে তীরের অনেক জায়গা ডুবিয়ে দিয়েছে। এর পরের বেতারে জানা গেল যে, হাজার হাজার লোক মারা গেছে আর শহরের পর শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উত্তর আমেরিকার আলাস্কায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেছে আর সমুদ্র-তীরের অনেক জায়গা সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি আর আরজেন্টিনার উপকূলেও ঐ রকম ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস আর ভূমিকম্প হয়েছে। চীনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলেও ঐ একই খবর। ইউরোপ বা আফ্রিকাও বাদ পড়েনি—সব জায়গা থেকে ধ্বংসের খবর শুনতে শুনতে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল।

এদিকে টেলিভিসনের পর্দায় ছবি থেকে থেকে যে রকম অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাতে বুঝতেই পারছিলাম যে শীগ্‌গিরই পর্দার কোনো ছবিই আর বোঝা যাবে না।

সেই রাত্রেই প্রথম উল্কা বৃষ্টি নজরে পড়ল। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সমানে এই ব্যাপার চলল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, গোটা কয়েক ছবি তুলে রাখলাম। এই প্রলয়ের পরেও আমরা যদি কেউ বেঁচে থাকি, তা হলে এই ছবি দেখে ভবিষ্যতের মানুষ বুঝতে পারবে সে কি এক চমকপ্রদ দৃশ্য।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, বাইরে তখনও বেশ অন্ধকার। রাত তখনও কাটেনি মনে করে, আবার ঘুমাবো ভাবছিলাম, এমন সময় পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। তারপরই মাটির নিচে থেকে থেকে গুমগুম শব্দ হতে লাগল আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই এলো

ভূমিকম্পের এক প্রচণ্ড ধাক্কা। খাবার ঘরের কাঁচের বাসন-পত্র সব ঝন ঝন করে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। তার শব্দ শুনতে পেলাম। ঐ ধাক্কার তাল সামলাতে না সামলাতে আরেক ধাক্কা। যদিও এখানকার সব বাড়ি এমন ভাবে তৈরি, যাতে ভূমিকম্পে ভেঙে না পড়ে, তবু ঐ দ্বিতীয় ধাক্কার পর ঘরের ভিতরে থাকার সাহস কারো রইল না। আশে পাশের সব বাড়ির লোকেরা বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকাডাকি আরম্ভ করেছিলেন। কাজেই আমরাও আর দেরি না করে একদৌড়ে বাইরে চলে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মনের এমন একটা অবস্থা হ'ল, যাকে ভয় বলা যায় না। ভয় একটা ব্যক্তিগত জিনিস, এটা তার বাইরে।

॥ আট ॥

বাইরে চলে আসার পরও ঐ রকম গুমগুম শব্দ করে বেশ কয়েকটা জোর ধাক্কা দিয়ে ভূমিকম্প থামলো। কিন্তু পায়ের তলায় মাটির কাঁপুনি একেবারে থামলো না। ধাক্কার চোটে আমরা প্রায় সকলেই মাটিতে বসে পড়েছিলাম। চারদিক ধুলোয় ঢেকে গেছিল। আকাশ ঘন অন্ধকার। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর বাজ পড়ছিল। আচমকা ঘনঘটা করে বৃষ্টি নেমে এলো, গায়ে জলের ফোঁটা পড়তেই চমকে উঠলাম। শীতকালে বৃষ্টির জল কোথায় কনকনে ঠাণ্ডা হবে, তা না হয়ে ও যে বেশ গরম বলেই মনে হ'ল। ছুড়দাড় করে আমরা সকলেই যে যার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরের ভিতরে চারদিকে ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। আবছা আলোতে দেখতে পেলাম ঘরের ঘড়িটা সাতট বেজে দশ মিনিট হয়ে থেমে রয়েছে।

শোবার ঘরে গিয়ে হাত ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে আটটা বেজেছে। এর মধ্যে দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে সেটা বুঝবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় বৃষ্টি থামলো বটে, কিন্তু ঘন কুয়াশার মতো ধুলোর জালে চারদিক ঢাকা, সূর্যের মুখও দেখা যাচ্ছিল না, তবে পুব থেকে আলোর আভাস আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই নতুন গোলকটা পুব আকাশে দেখা দিল আর তার অল্পক্ষণ পরেই বাতাস ছাড়লো। একেবারে গরম হাওয়া, পশ্চিম ভারতের গ্রীষ্মকালের 'লুর' কথা মনে করিয়ে ছিল। অনেকেই প্রথমটায় এই অদ্ভুত ব্যাপারে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই কারণটা বুঝতে পারলেন।

মানমন্দির থেকে লোক মারফত খবর এলো যে, পৃথিবীর চারদিকেই ভয়ানক ভূমিকম্প হচ্ছে। আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলো থেকে আর বিশেষ কোনো খবর আসছিল না, আর টেলিভিসন ত একেবারে অচল হয়ে গেছিল। পর্দায় কোনো চিহ্নই ধরা পড়ছিল না। সকাল সাতটার পর থেকে কলকাতার বেতারের কোনো সাড়া নেই। সকাল ছটার কিছু পরে শেষ খবর এসেছিল যে,

রাত দেড়টা থেকে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। শহরের অর্ধেক বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে. হতাহতের সংখ্যা হিসাব করা অসম্ভব। তেলের ডিপোয় আগুন লেগে সে এলাকায় লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে। সমুদ্রের ধারে হলদিয়া বন্দর থেকে শেষ খবর এসেছিল সেই সকাল সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটে। ভূমিকম্পের সঙ্গে সমুদ্রের জল প্রায় পঞ্চাশ ফুট ফুলে ফেঁপে পারের দিকে তীরবেগে ছুটে আসছে—তারপরই সব চুপ হয়ে গেছে। তবে বেতারে খুবই গোলমাল হচ্ছিল। যে রকম নৈসর্গিক বিপর্যয় ঘটছিল তার ফলে বেতার বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য নয়।

দারজিলিং থেকে শেষ খবর এসেছিল সকাল পৌনে সাতটায়। ভূমিকম্পে চারিদিকে ধ্বস নামছে আর গরম হাওয়া বইছে। তার সঙ্গে রয়েছে প্রচণ্ড বৃষ্টি। সব কটা পাহাড়ে নদীতে প্রবল বন্যা নেমেছে। আশে পাশে চারদিক থেকে এই একই রকম দুঃসংবাদ আসছিল।

একটা খুব বড় গোছের অঘটন যে হবে সেটা আমরা সব সময় ভয় করে এসেছিলাম। প্রলয় কি আকার নেবে, সেটাও এক রকম মোটামুটি ধারণা করেছিলাম। কিন্তু সেই প্রলয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। এই রকম একটা বিরাট নৈসর্গিক বিপর্যয়ের সামনে আমরা যে কত তুচ্ছ আর আমাদের ক্ষমতা যে কত নগণ্য, সেটা খুব ভাল করেই বুঝতে পারলাম।

নিজেরা যে জায়গায় রয়েছি, শুধু সেখানকার খবরাখবর নেওয়াই দেখলাম বেশ শক্ত ব্যাপার হয়ে পড়েছে। দূর-দূরান্তরে কি ঘটছে সেটা একমাত্র বেতারেই জানতে পারা যাচ্ছিল। কিন্তু তাও একে একে অনেক জায়গার বেতার চুপ হয়ে গেল। সে সব জায়গায় যা ঘটেছে সেটা শুধু কল্পনা করতে পারছিলাম। খুব সম্ভবই সেখানকার সত্যকারের ভয়ালরূপের কাছে আমার কল্পনাও হার মেনে যেতে পারে।

বেলা দেড়টা বেজে গেল, কিন্তু বাইরে সেই ঝাপসা অন্ধকার। ধুলোর জালের ভিতর দিয়ে নতুন গোলকটাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। বাতাস যেন আগুনের হল্কা। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, অথচ বৃষ্টির আর নামও নেই। পায়ের তলায় মাটি তখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ভূমিকম্পের সে রকম প্রচণ্ড ধাক্কা আর নতুন করে আসেনি বটে, তবে ভূমিকম্পটা একেবারে থেমে যায় নি। থেকে থেকে ছোটখাটো ধাক্কা তখনও আসছিল।

অন্যান্য দু'চারটা দেশ থেকে তখনও বেতারে খবর আসছিল। সব জায়গা থেকেই একই খবর। প্রচণ্ড ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস আর সমস্ত আগ্নেয়গিরিগুলো থেকে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত। অনেক জায়গায় ধ্বস নেমেছিল, কোনোও কোনোও জায়গায় মাটিতে বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছিল। তার ভিতর থেকে গরম বালি, গরম জল, গরম কাদামাটি এই সব বেরিয়েছিল। কোনোও কোনোও জায়গা আবার পঁচিশ তিরিশ ফুট নেমে গেছিল। কোথাও ভূমিকম্পে মাটির ওপর ঢেউ খেলে

গেছিল, কোথাও নতুন নতুন পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

চারদিক এমন ধূলোর কুয়াশায় ঢাকা সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। তবে ঐ নতুন গোলকটাকে একটা প্রকাণ্ড চাঁদের মতন দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলো স্নিগ্ধ কিন্তু এই অবস্থাতেও এটার কিরণ মোটেই ঠাণ্ডা নয়। ঘোর গ্রীষ্মকালের দুপুরের সূর্যের তেজকেও হার মানাচ্ছিল। গরম ঝোড়ো বাতাস বইছিল সমস্ত সময়। ঐ দমকা বাতাসে আশে পাশের কত গাছ যে ভেঙে পড়েছিল তার হিসাব ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থায় একটা কাক পর্যন্ত ডাকছিল না। সমস্তক্ষণ বাতাসের সোঁ সোঁ গর্জন ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে আসছিল না।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে আমাদের হিসাবে কোনও ভুল না থাকলে আমরা এখন চরম দুর্দশার অবস্থা কাটাতে চলেছি। আর ঘণ্টা বারো চোদ্দর মধ্যে এই গোলকটা অনেক দূরে চলে যাবে। তখন এখানকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় কেটে যাবে। তারপর আমরা ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে শুরু করতে পারবো। কিন্তু তখন আমাদের এই শস্য শ্যামলা পৃথিবীর কি চেহারা দেখতে পাবো সেটা ভাবতেও ভয় করছিল।

[চলবে]

চকমকি দাবানল আর বটুকমামা

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

বটুকমামা ছুটিছাটার দিনে পাড়ার প্রাণকেষ্ট কেবিনে-বসে বেলা বারোটা একটা পর্যন্ত এক থেকে বারো কাপ চা খাবে। সেখানে বসে বসে পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের হাজার গণ্ডা অভিযোগ, নালিশ, প্রতিবাদ শুনবে। একটা বড় খাতায় নাম, ঠিকানা, বয়স সব লিখে নেবে। লম্বা লাইন কেবিনের দোরগোড়া থেকে রাস্তার ফুটপাতের অনেক দূর পর্যন্ত একেবেঁকে যায়।

দশ বারো বছরের চকমকি এসে বলল, বটুক মামা, কাল রাত্তির আটটার পর আমাদের বেড়ালটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সব বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু তার টিকিটি নেই।

বটুকমামা চায়ের কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বলল, থানায় কি একটা খবর দিয়েছিস?

চকমকি প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে যায়, বলে, দাবানল বলল তোমায় আগে খবর দিতে।

বটুকমামা উত্তর শুনে খুশী হয়েছে। বলেছে, তা ভালই করেছিস অবিশ্যি। থানায় এখ্‌খুনি ছোটাছুটি করলে পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের ছোটাছুটি করিয়ে ছাড়বে। যাক, যা যা প্রশ্ন করছি আগে তার ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যাবি। কেমন?

চকমকির চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। বলে, জিজ্ঞাসা করো।

বেড়ালের রঙ কি?

তিন রকম। মাথা সাদা, গা সাদা-কালো, লেজ গুটিয়ে রাখলে কালো, খুললে সাদা।

মাথা নিচু করে বটুকমামা সব ঠিক-ঠিক লিখে নিল।

ওজন কত?

পাঁচ কে. জি.

খায় কী?

দুধ মাছ ভাত, এ ছাড়া চুরি করে যা পায়।

কুকুর দেখলে ভয় পায়?

যেমন তেমন কুকুর দেখে নয়।

তবে?

পুলিশের কুকুর।

কেন?

যদি ধরে নিয়ে যায় থানায়।

কোন নাম আছে?

ডাক নাম ম্যাও—ম্যাও, ভাল নাম পিঙ্গলাক্ষী।

বটুকমামা সব কিছু ঠিকঠাক লিখে নিয়ে বলল, ছবি আছে?

ফটো নেই, হাতে আঁকা ছবি আছে।

কে একেছে?

দাবানল।

ছবি যত তাড়াতাড়ি পারবি জমা দিয়ে যাবি। বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

কোথায়?

আমার বিজ্ঞাপনের কাগজে।

তোমার আবার বিজ্ঞাপনের কাগজ কোথায়?

আছিস কোথায়? 'শরসন্ধানী বিজ্ঞাপন' এই নামে কাগজে বেরচ্ছে।

কবে থেকে?

এই তো কাল থেকেই।

সব কথা বলে বটুকমামা চকমকিকে দু'টাকা জমা দিতে বলল। পরদিন দুটো টাকা আর দাবানলকে নিয়ে চকমকি যখন বটুকমামার কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে এল, বটুকমামা বলল, এই দ্যাখ, তোরা বিশ্বাস করছিস না—এই দ্যাখ কি জোর বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছে দাঁওমারা এ্যান্ড সন্স্—

দাবানল আর চকমকি দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, কই কই দেখি?

বটুকমামা পড়ে গেল।

জুতা হারাইলে বটুকবাবুর 'শরসন্ধানী বিজ্ঞাপনে' বিজ্ঞাপন দিবেন। তাহার পূর্বে 'দাঁওমারা এ্যান্ড সনস্' হইতে মনের মতো এক জোড়া জুতা ক্রয় করিবেন।

দাবানল আর চকমকি দুজনেই বলেছে, বা! বা! জুতো না কিনলে হারাবে কোত্থেকে?

বটুকমামা বলেছে, বেড়ালও তাই। আগে হারাবে তারপর তো খুঁজে পাবি।

চকমকি বলেছে, অনেক সময় জুতো হারালে এক পাটিও পাওয়া যায়—

বটুকমামা বলেছে, ঠিক আছে, বেড়ালের লেজ-মাথার যে কোন একটা খুঁজে পেলেই তো হ'ল?

দাবানল বটুকমামার কথাটা একটু চিন্তা করে সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, সে কি, বেড়ালের আধখানা নিয়ে কী হবে?

বটুকমামা বলেছে, আরে বুদ্ধু, জুতোর এক পাটিতে বা কী লাভ?

চকমকি বলেছে, অনেক সময় আরেক পাটি খুঁজে পাওয়া যায়।

বটুকমামা হেঁ—হেঁ করে হেসেছে। পরে বলেছে, বেড়ালের আধখানা পরে আর পাওয়া যাবে না কে বলেছে তোদের?

দাবানল বলেছে, পাওয়া গেলে জোড়া লাগানো যাবে বটুকমামা?

কোন যুগে বেঁচে আছ চাঁদ? মানুষ চাঁদকে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলল আর পৃথিবীর একটা সামান্য প্রাণীকে জোড়া দিতে পারবে না?

তা হলে রাস্তায় যে এত বেড়াল কুকুর কাটা পড়ে তাদের সব জোড়া লাগানো হয়? চকমকি জিজ্ঞাসা করেছে।

জোড়া লাগাবার আলাদা হাসপাতাল আছে। কাটা ইঁদুর বেড়াল কুকুর আসছে আর জোড়া লাগছে।—বটুক মামা যে-ভাবে হাত নেড়ে নেড়ে দেখাল তাইতে চকমকি আর দাবানল দুজনেই অবাক হয়েছে।

ওদের দুজনের অবাক অবাক চোখের দিকে চেয়ে বটুক মামা টেনে টেনে হেসেছে। তারপর বলেছে, কোথায় আছিস তোরা—এটা কি আমাদের যুগ। এই দ্যাখ না তোদের ছেলেপুলের টাইমে, চাঁদনি রাতে আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে যেই ডাকবে, নেমে এস তো চাঁদ, চাঁদ তরতর করে পৃথিবীতে নেমে আসবে।

চকমকি আর দাবানল দুজনেই জানে বটুকমামার মতো এত খবর আর কেউ রাখে না।

বটুকমামা বলেছে, যা এখন, আমার হাতে অনেক কাজ। বেড়ালের ছবি যদি ঠিক হয় তো বেড়াল দেখবি তোর কাছে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে।

দাবানল আর চকমকি দুজনে বটুকমামার কাছ থেকে ভরসা পেয়ে খুব খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

দুটো দিন কেন, চার চারটে দিনই চলে গেল। বটুকমামার 'শরসন্ধানী বিজ্ঞাপন' বেরল না। ওরা যখন কাঁদ কাঁদ হয়ে তাগিদ দিল, বটুকমামাকে একটুও সদয় মনে হ'ল না। বরং বটুকমামা চটে উঠে বলল, তোরা ভেবেছিস দুটো টাকা জমা দিয়ে আমার মাথা কিনেছিস না? এই না তোদের টাকা—কত জন টাকা জমা দিয়ে গেছে জানিস? এই দ্যাখ্, নামের লিস্ট।

সব বিজ্ঞাপন পেলে তবে তো কাগজ ছাপা হবে। একি খবরের কাগজ? খবর যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে কোন মতে একখানা কাগজ বেরিয়ে গেল? যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তার মনের অবস্থাটা কি বলত? তুই যেমন ভাবছিস তোর বেড়ালটার কথা, আর যার কুকুর হারিয়েছে, সে? কিনা হারাতে পারে দুনিয়ায়। সবাই বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে ছোটাছুটি করছে। ছেলে হারাতে পারে, বুড়ো হারাতে পারে, মাস্টার হারাতে পারে, ছাত্র হারাতে পারে, গামছা হারাতে পারে, তোয়ালে হারাতে পারে, তেল-সাবান, জুতো মোজা, টুথ্‌ব্রাস টুথপেস্ট্‌, বই—খাতা—বল না বলে যা। দু'চারটে নাম মনে আসছে না?

দাবানল আর চকমকি দুজনেই একসঙ্গে শুরু করেছে, পেনসিল হারাতে পারে কলম হারাতে পারে, বেন্‌চ্‌ হারাতে পারে ডেস্‌ক্‌ হারাতে পারে ইতিহাস হারাতে পারে ভূগোল হারাতে পারে, অঙ্ক হারাতে পারে, বিজ্ঞান হারাতে পারে, ব্ল্যাক্‌ বোর্ড হারাতে পারে সংস্কৃত হারাতে পারে—

বটুকমামা যখন বুঝতে পেরেছে না থামালে দাবানল বা চকমকি কেউ থামবে না, তখন বলেছে, থাম থাম অনেকগুলো হয়ে গেছে।

চকমকি বলেছে, আর একটা শুধু বটুকমামা—

চকমকির মুখের দিকে চেয়ে বটুকমামার কেমন মায়া হ'ল। বলল, আমার হাতে অনেক কাজ, চটপট বলে ফ্যাল্‌।

চকমকি তৈরী হয়েই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, বটুকমামা হারাতে পারে, 'শরসন্ধানী বিজ্ঞাপন' হারাতে পারে।

চকমকির কথা শুনে বটুকমামার মুখটা কেমন চুপসে গেল একটি মুহূর্তে। তারপর চকমকির কথাটা এক ঢোকে গিলে নিল বুঝি বটুকমামা। মুখে হাসি টেনে আম্‌তা করে বলল, তা—ও অসম্ভব নয়। বটুকমামা তোদের পাড়া থেকে হারিয়ে অন্য পাড়ায় চলে যেতে পারে,, আর 'শরসন্ধানী বিজ্ঞাপন'ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জায়গা জুড়ে বসে থাকতে পারে। তবে একটা কথা। তার আগে তোর বেড়ালটা খুঁজে পাওয়া দরকার তো।

ঠিক বলেছ বটুকমামা, ঠিক বলেছ!—চকমকি তাড়াতাড়ি বলেছে।

তবে যে বড় বলছিলি 'শরসন্ধানী বিজ্ঞাপন' হারিয়ে যেতে পারে? এই যে কার কোথায় কি হারাচ্ছে তার জন্যে খোঁজ খবর চালাচ্ছি সেটা কি কারও নজরে পড়ছে। আমার বিজ্ঞাপনের রেট্‌ কত কম বল তো? শোন, আমার বিজ্ঞাপনের কাগজের জন্যে কিছু চাঁদা তোল তো তোরা। বেশি নয়, এই ধর গোটা পঞ্চাশেক টাকা?

দাবানল আর চকমকি বলেছে, ও তো কিছুই নয় বটুকমামা, সরস্বতী পূজোর সময় যদি একশো দেড়শো টাকা তুলে ফেলতে পারি তো 'শরসন্ধানীর' জন্যে পঞ্চাশ টাকা তুলতে পারব না?

বেশ তো। দ্যাখ্‌ না—চটপট যদি তুলে ফেলতে পারিস।

বটুক মামার কথায় দাবানল আর চকমকি মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগল।

যাবার আগে চকমকি বলল, তাহলে আমার বিজ্ঞাপন কবে বেরুবে বটুকমামা?

এই তো আর কটা বিজ্ঞাপন পেলেই একসঙ্গে ছেপে দেব। তাছাড়া ভেবে দেখলাম বেড়ালের ছবি ছাড়া তো বিজ্ঞাপন ছাপা যায় না। ভাল কথা, তোর বেড়ালের ছবি ঠিক একেছে তো দাবানল?

মনে তো হয়, চকমকি ভয়ে ভয়ে বলে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার বিজ্ঞাপনের কাগজের জন্যে বিল বই ছেপেছ বটুকমামা? চাঁদা যে তুলব বলছ তা বিল বই কই?

বটুকমামা বলেছে, আরে সরস্বতী পূজোর বিল বই আছে তো? ওইতেই চালিয়ে দে। বলবি

আদ্ধেক টাকা যাবে পাড়ার পুজোয়, আর আদ্ধেক টাকা যাবে পাড়ার কাগজে।

দাবানল আর চকমকি আরও কি বলতে চাই ছিল কিন্তু বলা হ'ল না। বটুকমামা হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বলেছে, আজ আর কিছু শোনার সময় নেই। হাতে অনেক কাজ।

এর পর আরও কটা দিন, তারপর আরও কটা দিন গেল। বটুক মামার 'শরসন্ধানীর' কোন সাড়া শব্দটি নেই। বটুক মামাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছে, আরে আর তিনটে বিজ্ঞাপন পেলেই তো হয়ে যায়—আমার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা—পাচ্ছি কোথায়? এই দ্যাখ্ না, একটা আসার কথা বিদ্যাসাগর এ্যাভেনিউ থেকে, একটা চার্চল্ বার্চ্হিল মার্চ্স্ট্রীল রোড থেকে, আর একটা এই কাছেই মোম্বাসা না দুর্বাসা স্ট্রীট কোথা থেকে যেন। পাবি পাবি, বেড়াল হারিয়ে গেছে বলেই তো খুঁজে পাবি। তা পঞ্চাশ টাকার কথাটা তোদের মনে আছে তো?

দাবানল আর চকমকি একসঙ্গে মাথা নামিয়ে ঘাড়ের ওপর কাত্ করেছে।

বছরের মাঝামাঝিও পার হয়ে গেল। চকমকি একদিন বেড়াল সম্পর্কে ভাল মন্দ হাজার গণ্ডা কথা ভাবতে ভাবতে ইস্কুল যাচ্ছে, এমন সময় দেখল বটুকমামা রিকশা করে আসছে, পাশে একটা বেড়াল চুপটি করে বসে আছে।

চকমকিকে দেখে বটুকমামা রিকশা থামিয়েছে, বেড়ালসুদ্ধ রিকশা থেকে নেমেছে। একগাল হেসে বলেছে, আমি বেঁচে থাকতে বেড়াল পাওয়া যাবে না হতে পারে? এই যে তোর বেড়াল। দাবানলের আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নে। বিজ্ঞাপনের আগেই বেড়াল এসে হাজির।

চকমকি বটুকমামার হাত থেকে বেড়ালটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল। তারপর কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, এ আমার ম্যাও—ম্যাও নয়, পিঙ্গলাক্ষীও নয়।

তবে? হুমকি দিয়েছে বটুকমামা।



অন্য বেড়াল মানে ?

এ অন্য বেড়াল।

অন্য বেড়াল মানে ?

আমার বেড়াল নয়।

কী করে বুঝলি ?

লেজ দ্যাখো না ?

কী হয়েছে ল্যাজে ?

গুটিয়ে রাখলে সাদা, খুললে কালো। আমার বেড়ালটার তো উলটো।

তা দাবানল কি ছবিতে এ সব একেছে? শুধু বেড়ালের মুখ। বুঝব কী করে? যা ডেকে নিয়ে আয় দাবানলকে। আমি রিকশায় বসে আছি।

চকমকি বটুক মামার কাছে ইস্কুলের বইপত্তর রেখে ছুটল দাবানলের খোঁজে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দাবানলকে নিয়ে চকমকি হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল।

বটুকমামা বাজখাঁই ধমক দিয়ে বলেছে স্কুইলে এই ড্রইং শিখছ? বেড়ালের মাথা একেছ, লেজ আঁকব কি আমি? লেজ গুটিয়ে রাখলে কালো, খুললে সাদা—এ সব কি একে দেখিয়েছিস? শুধু মাথা দেখে আমি মাথামুণ্ডু কী বুঝব? যেমন ছবি পেয়েছি তেমন

খুঁজেছি। হুশিয়ার হয়ে বুঝেসুঝে ঠিক ওই রকম একটা লেজ এঁকে নিয়ে আসবি। বুঝলি ?

বটুক মামার বকুনি খেয়ে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল দাবানল। তার মতো আর্টিস্টকে কিনা বলে ড্রইং জানে না ? এবার পাতাজোড়া একটা লেজ এঁকে দেখিয়ে দেবে।

মাথা নিচু করে দুজনে চলে যাচ্ছিল। নরম গলায় বটুকমামা তাদের ডাকল। কাছে এলে দুজনের দু'কাঁধে দু'খানা হাত রেখে বলেছে, চাঁদার কথাটা তোদের মনে আছে তো ?

দুজনেই ভুলে গিয়েছিল চাঁদার কথা। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কিসের চাঁদা বটুকমামা ?

কেন 'শরসন্ধানী'-র কথা মনে নেই তোদের ?

ওহ্ হো, দুজনের মুখ থেকেই এক সঙ্গে বেরিয়েছে।

চকমকি দাবানলের দিকে তাকিয়েছে। আর তাইতেই বুঝি দাবানলের মনে পড়ে গেছে। সে বলেছে, তুমি বিল বই ছাপো বটুকমামা, সরস্বতী পুজোর চাঁদার বই দেখে কেউ 'শরসন্ধানী'-র জন্যে চাঁদা দিতে চায় না।

ওরা দুজনে ভেবেছিল বটুকমামা এখুনি বলবে, তোরা এখন যা, হাতে অনেক কাজ।

কিন্তু বটুকমামা তেমন কিছু বলল না। শুধু মাথা নিচু করে বলল, তা হলে 'শরসন্ধানী' বার করার আগে বিলবইখানাই আগে ছাপাই। কী বলিস ?

দাবানল আর চকমকি এক সঙ্গে মাথা নেড়ে কাত্ করে ঘাড়ের ওপর রেখেছে। দাবানল নিচু গলায় শুধু বলেছে : হ্যাঁ বটুকমামা, তুমি চাঁদা তোলার বিলবই ছাপাও, আমি পাতাজোড়া বেড়ালের শুধু একটা লেজ এঁকে ফেলি। তারপর তুমিও পঞ্চাশ টাকা পাবে, আর চকমকিদের পিঙ্গলাক্ষীও ফিরে আসবে।

সূর্যমুখী

মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম

ছুটির সকালটাই মলয়ের কাছে বিতিকিচ্ছিরী ঠেকলো। ঘুম থেকে উঠেই সবিতার সাথে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল।

খালি খালি ঝগড়া হয়ে গেল। এই অঘটনটা ঘটানোর তার কোন ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু তবু হয়ে গেল।

শীতের সকালে লেপটা ভালো করে জড়িয়ে আয়েশ করে ঘুমুচ্ছিল মলয়। জানালার ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু রোদ ঘরে আসছিল।

এদিকে সবিতাটা ঘরে ঢুকেই তার লেপটা ধরে দিলো একটান। ভীষণ রাগ হয়ে গেল মলয়ের।

রেগে উঠেই সবিতার বেণীটা জোরে টেনে ধরলো।

দৌড়ে পালাতে চাইছিল। হঠাৎ মলয় বেণীটা ছেড়ে দিল। আর সবিতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওহ মাগো! বলে চীৎকার করে উঠলো সবিতা। মা তখন ডাকতে আসছিলেন মলয়কে। রোজ দেরি করে বিছানা ছাড়ে মলয়।

কিন্তু পুঁচকে সবিতাটার খবরদারী ভীষণ অসহ্য লাগে মলয়ের। পড়ে গিয়ে সবিতার হাঁটুর অনেকটা চামড়া থেতলে গেছে। যন্ত্রণায় সবিতা কেঁদে ফেললো।

সবিতাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা এমন হবে তা মোটেই ভাবেনি মলয়।

তাই প্রথমে সবিতা এবং পরে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মলয় বোকার মতো হয়ে গেল।

সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েই তার অন্যায়ের মাত্রাটা অনুমান করে নিয়েছিল।

তবু মলয় কিছুই বলতে পারল না।

সবিতাকে ধাক্কা দিলি কেন? পাজী ছেলে কোথাকার। ছোট বোনকে মারতে আছে হতভাগা ছেলে?

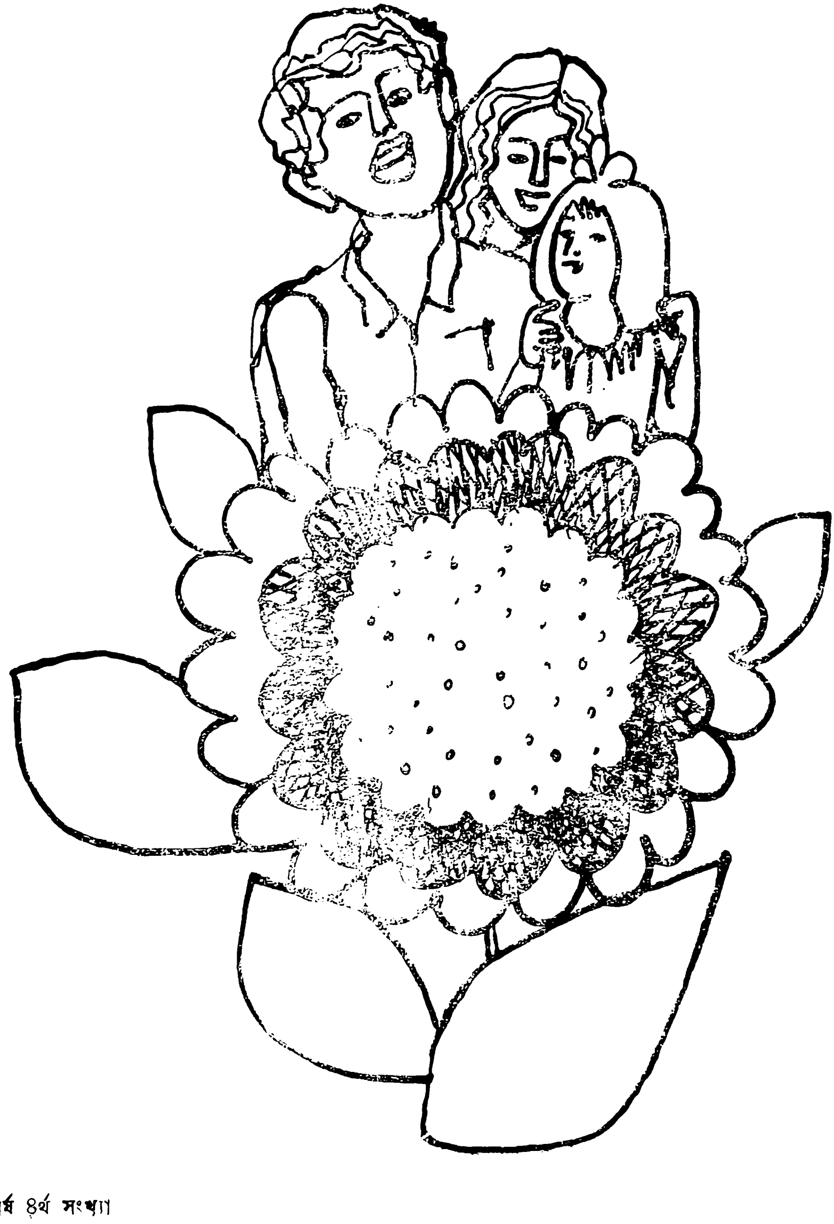
আর কিছুই বললেন না মা।

তবু মলয়ের বুকে পাজী ছেলের কথাটা খচ খচ করতে লাগল। মা সবিতার পায়ে ডেটল দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

মলয় মুখ ধুলো। দাঁত ব্রাশ করল। অবশেষে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসলো। তার উলটোদিকে সবিতাও বসলো। কিন্তু সবিতা আজ আর তার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। অন্যদিন হলে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। চুপচাপ নাস্তা খেয়ে যাচ্ছিল সবিতা।

বাবা কিছুক্ষণ পর টেবিলে এসে বসলেন।

মলয় নীচদিকে মুখ করে নাস্তা খেয়ে চলেছে একমনে। আর ভয় ভয় করছে সারাক্ষণ, কখন কী



জিজ্ঞেস করেন বাবা।

নাস্তা খেতে খেতে গম্ভীর হয়ে ডাকলেন মলয়···

মলয় সপ্রশ্ন ভয়ার্ত তাকালো বাবার দিকে।

তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, জানো না কত বড়ো অন্যায় করেছো। ছোট বোনকে আঘাত দেয়া···আর তাছাড়া ছোটদের সব সময় স্নেহ করতে হয়।

মলয় শশব্যস্ত হয়ে বলতে চাইলো—বাবা, আমি তো ধাক্কা দিইনি ওকে···আমি···

জানি মলয়। সবিতা বলেছে। কিন্তু তুমি তো জানতে ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে। আসলে তুমি চাইছিলে সে পড়ে যাক্, তাই না মলয়?

মলয় অনেক কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু অভিমানে তার কণ্ঠ বুজে আসতে থাকে।

মাও তাকে ভৎর্সনা করেছিলেন।

ভীষণ রাগ হলো সবিতার উপর। ছুটির সকালটাই এমন হবে, তা যদি আগে ভাবতে পারতো।

কাল রাতে কত কিছু ভেবে রেখেছিল মলয়।

টেবিলটা সবিতাকে নিয়ে নতুন করে সাজাবে। পিচবোর্ড কেটে খেলার ঘর বানাবে। সবিতার বন্ধু অনিতার আজ আসার কথা। তার পুতুলের সঙ্গে আজ সবিতার পুতুলের বিয়ে। আরো কত কিছু। দুজনে খেলতে খেলতে বারান্দায়—ফুলের টবগুলোতে জল দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। ঘরের পিছনে দুজনের দু'টো জমির প্লট। সেখানে তরকারি ফলানোর জন্য জমি তৈরী করার কথা ছিল। কিন্তু আজ বোধ হয় কিছুই করা হবে না। অনিতা আসলেও আসতে পারে। মলয়ের সঙ্গে বোধ হয় কথাই বলবে না।

সবিতা বোধ হয় তাকে দলে টানতে পারে।

কিন্তু মলয় কি করবে? একা একা মোটেই ভালো লাগছিল না। ছবি আঁকার খাতাটা খুলে পুরনো ছবিগুলি দেখতে থাকে। কখন রঙিন মোমের পেন্সিলগুলো তুলে নেয় সে টের পায় না। অন্যমনস্কভাবে খাতায় আঁকিবুকি করতে থাকে। এক সময় বিরক্ত হয়ে খাতাটা বন্ধ করে রেখে দেয়। কিছু অঙ্ক কষার বাকী ছিল। তাই অঙ্ক বইটা খুলে অঙ্ক কষার চেষ্টা করে। কিন্তু একটিও হলো না। কাটাকাটি করতে থাকে শুধু। জানালার বাইরে অশোক গাছটার ডালে হলদে একটা পাখী উড়ে গিয়ে বসে। সেদিকে চেয়ে ভাল লাগে মলয়ের। অশোক গাছটার পাতাগুলো কী সুন্দর ঘন সবুজ।

আগে মলয় জানতো না এটা অশোক গাছ। একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, এ আমগাছটায় একটাও বউল ধরে না কেন?

বাবা বলেছিলেন, ওটা তো আমগাছ নয় মলয়, দেখতে অবশ্য একই রকম, আসলে ওটার নাম অশোক।

বিষণ্ণ মনে মলয় সিঁড়ি দিয়ে ছাদের দিকে উঠে যায়। তখন সূর্যের হলুদ হলুদ সোনা রঙ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সবুজ ঘাসে শিশির বিন্দুগুলো টলমল করতে থাকে। শেফালী গাছের দিক থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। মলয় বুকভরে শ্বাস টানে।

ভালো লাগে মলয়ের। ঘাসের বুকে ছড়িয়ে

রয়েছে অসংখ্য শেফালী ফুল। হঠাৎ মনে হলো আজ মায়ের জন্য ফুল কুড়ানো হয়নি। বোধ হয় সবিতা তাকে ফুল কুড়োবার জন্য ডাকতে এসেছিল। অথচ কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল।

সবিতার মুখটা বিষণ্ণ সন্ধ্যার আধো আলো আধো অন্ধকারে যেন ভাসতে থাকে। বড়ো দুঃখ হয় সবিতার জন্য। কিন্তু হতভাগী মেয়েটার পাকা পাকা কথা আর ন্যাকামীটাই অসহ্য লাগে মলয়ের।

মনে মনে সবিতার বিরুদ্ধে তার ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কোন কূল পায় না। সে কিছুতেই নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারলো না। যাক্, যা হবার হয়েছে। নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহলে আজ কেরাম খেলাও যে হবে না।

বড়ো দুঃখ হয় মলয়ের। নিজের উপর রাগ হয়। কেন যে এমনটা করতে গেল।

আকাশের দিকে চাইলো মলয়। আকাশটা বড়ো সুনীল মনে হয়। এমন সময় সেই হলদে পাখীটা অশোক গাছটা থেকে দূরে উড়ে যেতে থাকে। সেদিকে চেয়ে থাকে মলয়। এদিকে সিঁড়ি দিয়ে দুজন উঠে আসে।

অনিতা লাল সোয়েটার পরেছে। গালফোলা মেয়েটাকে আজ বড়ো সুন্দর লাগছে। কিন্তু এরা পেছনে এসে দাঁড়ালে সে দূরে গম্ভীর হয়ে চেয়ে থাকে।

দাদা, এ্যাই দেখো, অনিতা এসেছে। চলো আমরা কেরাম খেলি।

সবিতার 'দাদা' ডাকটা বড়ো ভালো লাগে মলয়ের। অভিমানী মলয়ের চোখে জল এসে যায়।

মলয় পেছন ফিরলে অবাক হয়ে সবিতা বললো, তুমি কাঁদছো দাদা?

বাঁহাতের পিঠ দিয়ে জল মুছে ফেলে বোকার মতো বললো, দূর···কই···? ওই পিয়ারা গাছটা থেকে পোকা-টোকা পড়ে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে সবিতা বললো, কই দেখি···দেখি···

না, এখন চলে গেছে। লজ্জার হাসি হাসে মলয়।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে আসতে বললো, জানো দাদা, তোমার সূর্যমুখী গাছটায় না সেই ফুলটা ফুটেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। দেখবে এসো।

অনেক বড়ো?

হ্যাঁ, অনেক বড়ো—আর কী সুন্দর!

চল চল।

বাগানে এসে মলয় সবিতা আর অনিতা দেখলো মলয়ের হাতে লাগানো গাছটায় সত্যি সুন্দর ফুল ফুটেছে। মলয় তখন সবিতা আর অনিতার দিকে চেয়ে থেকে খুশী হয়ে বললে: সূর্যমুখী খুব সুন্দর, না রে?



আর এক গোপাল ভাঁড়

খাজিমউদ্দীন আহ্‌মেদ

গোপাল ভাঁড়ের নাম তোমরা কে না শুনেছ--আজ তোমাদের এমনি আর একজন হাস্যরসিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এর নাম হ'ল তেনালীরামণ। তেনালী-রামণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এটা হল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। মহামতি আকবর যেমন বীরবলকে ভালবাসতেন তেমনি সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ও তেনালীরামণকে তাঁর রাজসভায় উল্লেখযোগ্য রত্ন হিসেবে বিবেচনা করতেন। তেনালীরামণ যেমন ছিলেন বিচক্ষণ তেমনি ছিল তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি। হঠাৎ হঠাৎ এমন মজাদার সব ঘটনার কথা তিনি বলতেন যে, নানান ভাবনায় মুখ গোমড়া করে থাকা মন্ত্রীরাও হো হো করে হেসে উঠতেন। তিনি সবাইকেই হাসাতেন। এই হাসি ছিল নির্মল। কুরুচিপূর্ণ রসিকতা তিনি করতেন না। কাউকে অপমানজনক কথা বলেও হাস্যরস সৃষ্টি করতেন না তেনালীরামণ। তোমরা যখন বড় হয়ে আরও অনেক পড়বে তখন তেনালীরামণের কথা বিশদ ভাবে জানতে পারবে। তবে এখানে তোমাদের একটি কথা বলে রাখি। তেনালীরামণ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। একমাত্র বীরবল ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না।

এই বারে একটি মজার ঘটনা বলছি তোমাদের শোনো। রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধকৃত্যের জন্য বিপুল আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বিস্তর ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। তাঁরা খেলেনও প্রচুর। অনুষ্ঠানের শেষদিন রাজা কৃষ্ণদেব রায় ব্রাহ্মণদের মূল্যবান বস্ত্র, সোনা, মণিমাণিক্য প্রভৃতি উপহার দিলেন। এছাড়া একটা আমও দিলেন উপহার হিসেবে। এই আম কি দিয়ে তৈরী জান? একদম নির্ভেজাল সোনা। রাজমাতা মৃত্যুর কিছু পূর্বে আম খেতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আম নিয়ে আসবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মাতৃদেবীর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে না পারার জন্য কৃষ্ণদেব রায়ের দুঃখের শেষ ছিল না। রাজা ভেবেছিলেন ব্রাহ্মণদের সোনার আম উপহার দিলে তাঁর মায়ের আত্মা শান্তি লাভ করবে। তিনি মনে মনে তৃপ্ত হলেন।

তেনালীরামণও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রাজা এত মূল্যবান সামগ্রী অলস ব্রাহ্মণদের উপহার দিলে তিনি চিন্তা করলেন যে এটা অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এতে রাজকোষের ক্ষতি হবে। কিন্তু তেনালীরামণ রাজাকে কিছু বলতে পারলেন না। তিনি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

বছর ঘুরে সময় এল। তেনালীরামণ তাঁর মায়ের মৃত্যু বার্ষিকী পালনের আয়োজন করলেন। ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করা হ'ল। এর পরে তাঁরা পুরস্কার গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় তেনালীরামণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে উত্তপ্ত একখানা লোহার চাবুক দিয়ে ব্রাহ্মণদের আঘাত করতে শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণরা উত্তেজিত এবং অপমানিত হয়ে রাজার কাছে নালিশ জানালেন। রাজা তাঁর এই আচরণের কৈফিয়ত চাইলেন। তেনালীরামণ বিনয় সহকারে জানালেন—"হে রাজন। আপনার মায়ের মৃত্যুর পরে আপনি সোনার আম উপহার দিয়েছিলেন। এর কারণ আপনিই ভাল জানেন। আমার মা সন্ন্যাস রোগে ভুগতেন এবং মাঝে মাঝেই মূর্চ্ছা যেতেন। উত্তপ্ত লোহার চাবুক দিয়ে আঘাত করলেই তাঁর মূর্চ্ছার উপশম হ'ত। তিনি মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও মূর্চ্ছাক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য উত্তপ্ত লোহার বেত্রাঘাত করতে বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু আঘাত করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ভাবে তাঁর শেষ ইচ্ছে অপূর্ণ রয়ে গেছিল। আমার মায়ের আত্মার শান্তির জন্য আপনার পালিত পথই অনুসরণ করেছি মাত্র প্রভু।" এই বলেই রাজার মুখের দিকে তাকালেন তেনালীরামণ।

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণরা তাঁদের বেদনার কথা ভুলে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও অংশ নিলেন এই হাসিতে। এইবারে তোমরা জানলে তো, তেনালীরামণ কেমন মজার মানুষ ছিলেন।

গল্প-বইয়ের দেশ

রবার্ট লুইস স্টিভেনসন
অনুবাদঃ **সামসুল হক**

সন্ধেবেলা ঘরের বাতি যখন জ্বলে
বাবা ও মা বসেন এসে চুল্লি ঘিরে ;
আরাম ক'রে গল্প ও গান কেবল চলে,
থাকেন না আর অন্য কোনো খেলার ভিড়ে।
হেঁট-হামা দি এইটুকু 'টয় গান'টি হাতে
দেয়াল ঘেঁষা অন্ধকারে তখন আমি ;
অরণ্য-পথ দারুণ ঘুরে গহন রাতে
এক সময়ে সোফার পিছে পৌঁছে থামি।
দেখতে আমায় কেউ পাবে না, রাত্রিবেলা
বীর শিকারীর তাঁবুর নিচে শুলুম তবে,
আমার পড়া-বইয়ের সাথে করছি খেলা
যতক্ষণ না ঠিক ঘুমোবার সময় হবে।

এই তো পাহাড়, এই তো গহন অরণ্যানী,
এই তো আমার নির্জনতা তারার ঘরে ;
ঐ যে নদী—নদীর পাড়ে সিংহ, জানি,
গর্জনে দিক কাঁপিয়ে আসে জলের তরে।
অন্যদেরও পাচ্ছি দেখা, অনেক দূরে,
আগুন জ্বালা তাঁবুর নিচে নিদ্রারত ;
সেই দলটির চতুর্দিকে বেড়াই ঘুরে
অগ্রগামী রেড্ইণ্ডিয়ান সেনার মতো।
তাই তো হঠাৎ ধাইমা আমায় ডাকতে এলে
স্বদেশ ফিরি সাত সাগরের ওপার থেকে,
যাই বিছানায় পিছন দিকে দৃষ্টি মেলে—
আমার প্রিয় গল্প-বইয়ের দেশটি রেখে।*

*Land of Story Books/R.L. Stevenson

রামায়ণের গল্প

অভিশাপ ও আশীর্বাদ

রবিদাস সাহা রায়

সরযূ নদীর তীরে মনোরম এক রাজ্য অযোধ্যা। অপরূপ সেই রাজ্যের শোভা। মৃদুমন্দ সমীরণ শালবনের মাথায় শিহরণ জাগায়, সরযূর শান্ত জলে ঢেউ তোলে। রাত্রি বেলায় চাঁদের জ্যোৎস্না সারা রাজ্যে যেন তার রূপালী চাদর বিছিয়ে দেয়।

রাজপ্রাসাদের শোভাও অতি বিচিত্র। সেখানে বাস করেন সেই রাজ্যের রাজা দশরথ। তিনি যেমন গুণবান তেমনি ধার্মিক।

দশরথের পিতা ছিলেন অজ আর পিতামহ ছিলেন রঘু। রঘুর দান-কাহিনী ছিল সর্বত্র বিদিত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর বংশের নাম হয়েছিল রঘু-বংশ। সেই বংশেরই উপযুক্ত রাজা দশরথ। তিনি ছিলেন যেমন পুণ্যবান তেমনি বীর। অন্য রাজারা তাঁর ভয়ে যেমন সশঙ্ক থাকতেন তেমনি তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন।

অল্প বয়সেই দশরথ পিতৃমাতৃহীন হন। তখন কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি তাঁকে নিজের ছেলের মত লালন পালন করতে থাকেন।

বশিষ্ঠের শিক্ষাগুণে দশরথ সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি এক আশ্চর্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করলেন—তার নাম শব্দভেদী। সেই অস্ত্রের এমনই গুণ যে চোখে না দেখেও কেবল শব্দ শুনেই লক্ষ্যবস্তুকে বিঁধতে পারা যায়।

রাজা দশরথের কোন কিছুর অভাব ছিল না। ধন, জন, শক্তি, যশ সবই তাঁর প্রচুর ছিল। তাঁর তিনজন পরম রূপবতী ও গুণবতী রাণী ছিলেন—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা।

দশরথের সুশাসনে রাজ্যে শান্তি ছিল। প্রজারা সুখে শান্তিতেই বাস করতো।

কিন্তু দশরথের মনে একটি দুঃখ ছিল। তিনি বৃদ্ধ হতে চললেন তবু কোন সন্তানের মুখ দেখতে পেলেন না। যাগ-যজ্ঞ অনেক করলেন তবু কোন ফল হলো না।

দশরথের মৃগয়া করার খুব শখ ছিল। যখন তাঁর মন ভালো লাগতো না, তখন তিনি মৃগয়া করতে বেরিয়ে পড়তেন।

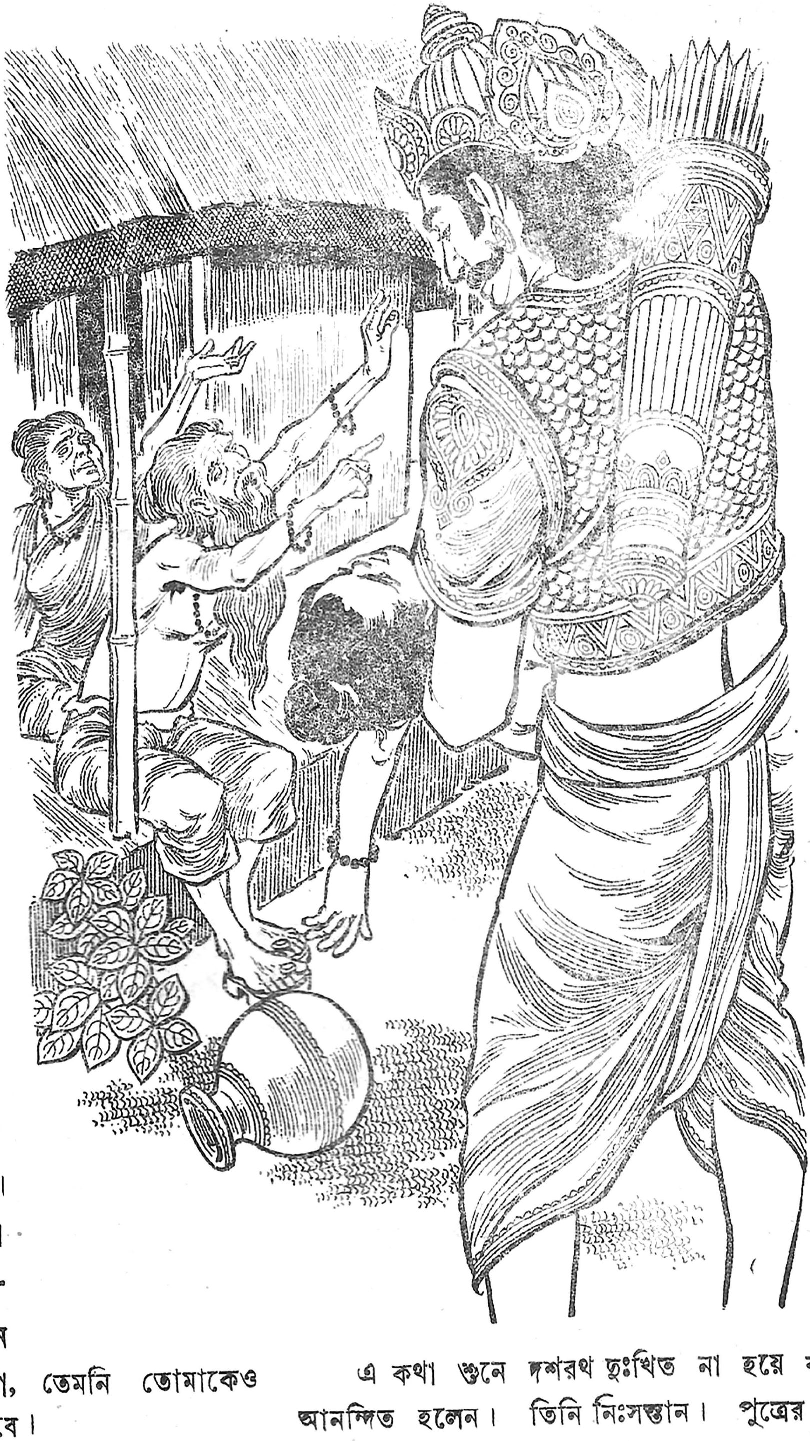
একদিন দশরথ অনেক দূরে শ্রীফলের বনে মৃগয়া করতে গেলেন। সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো। বনে প্রবেশ করে হরিণের জলপান করবার মত শব্দ শুনতে পেলেন। তখন সেই শব্দ লক্ষ্য করে তিনি শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই শুনতে পেলেন মানুষের করুণ চীৎকার। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখলেন সেই শর কোন হরিণ শাবকের গায়ে বিদ্ধ হয়নি, তাতে এক মুনি বালক আহত হয়েছে। বালক সরোবরের তীরে কলসীতে জল ভরছিল, সেই জল ভরার শব্দকে দশরথ হরিণের শব্দ বলে মনে করেছিলেন।

দশরথকে দেখেই মুনিপুত্র বলে উঠলো—রাজা, তুমি ভুল করে একি করলে? কিন্তু তোমার কোন দোষ নেই। এ আমার পূর্বজন্মের পাপের ফল। পূর্বজন্মে আমি রাজকুমার ছিলাম। তখন নিষ্ঠুরের মত কত বন্য পাখী শিকার করেছি। তাই এ জন্মে আমার এ দশা হলো। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু মা বাবার জন্য। তাঁরা দুজনেই অন্ধ। আমিই

তাঁদের ক্ষুধার ফল ও তৃষ্ণার জল যোগাতাম। আমার নাম সিন্ধু। আমার মা-বাবা এই বনেই বাস করেন।

রাজা দশরথ তাড়াতাড়ি সিন্ধুর বুক থেকে বাণটি খুলে ফেলে তার সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। সে চিরকালের মত চোখ বুজলো। রাজা মৃত বালককে কোলে নিয়ে অনুতাপ করতে করতে তার পিতা মাতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন কাছেই তাঁদের আশ্রম।

অন্ধ মুনি ও তাঁর পত্নী সব ব্যাপার জানতে পেরে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মুনি বললেন—তুমি দেশের রাজা, অথচ বিনা দোষে আমার ছেলেকে মারলে। সেই দুঃখে আমরাও বাঁচবো না। তাই তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, আমাদের যেমন পুত্র শোকে মৃত্যু হলো, তেমনি তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণ দিতে হবে।



এ কথা শুনে দশরথ দুঃখিত না হয়ে বরং আনন্দিত হলেন। তিনি নিঃসন্তান। পুত্রের মুখ

দর্শন করে যদি তাঁর মৃত্যু হয় সে তো খুবই ভাগ্যের কথা। এ যেন অভিশাপ নয়, এ আশীর্বাদ।

দশরথ বললেন—মুনিবর, আমার যে কোন পুত্রসন্তান নেই। পুত্রের আকাঙ্ক্ষা আমার অনেক দিনের, কিন্তু কেমন করে পুত্রের মুখ দর্শন করবো ?

সে কথা শুনে অন্ধ মুনি বললেন—রাজা, নিঃসন্তান বলে দুঃখ করো না। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাও, তা হলেই তুমি সন্তান লাভ করবে।

দশরথ ফিরে এসে অন্ধ মুনির কথা মত মহা ধূমধাম করে যজ্ঞ শুরু করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনা হলো। লোকজনের সমাগমে এবং দ্রব্য-সামগ্রীতে রাজধানীতে আর তিল ধারণের জায়গা রইল না।

যজ্ঞ শেষ হতেই অগ্নিকুণ্ডের ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন কৃষ্ণবর্ণের এক মহাপুরুষ। তাঁর পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র আর হাতে সুবর্ণ থালা। সেই থালা পায়সে পরিপূর্ণ। মহাপুরুষ বললেন—মহারাজ, তোমার যজ্ঞ সফল হয়েছে। এই পায়স তোমার রাণীদের আহার করতে দাও তাতে পরম গুণবান সন্তান লাভ হবে।

পায়সে পরিপূর্ণ পাত্র রাজার হাতে দিয়েই মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দশরথ মহা উল্লাসে সেই পাত্র হাতে নিয়ে অন্তঃপুরে এসে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে দেখতে পেয়ে বললেন—তোমরা এই পায়স ভাগ করে খাও।

কৌশল্যা ও কৈকেয়ী পায়স ভাগ করে নিলেন।

সুমিত্রা কাছে ছিলেন না বলে তাঁর কথা কারুর মনে পড়লো না। একটু পরেই সুমিত্রা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাঁদের ভাগ থেকে এক ভাগ করে পায়স সুমিত্রাকে খেতে দিলেন।

সুমিত্রার মন তাতে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। তিনি বললেন—দিদি, তোমরা যেমন তোমাদের পায়সের ভাগ আমাকে দিলে, তার ফলে আমার যে পুত্র হবে, সেই পুত্র তোমাদের পুত্রের চিরকাল দাস হয়ে থাকবে।

তারপর যথাসময়ে রাণীদের পুত্র হলো। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী এক ভাগ করে পায়স খেয়েছিলেন বলে প্রত্যেকেই একজন করে পুত্র লাভ করলেন। সুমিত্রা দু'ভাগ খেয়েছিলেন বলে তাঁর দু'টি পুত্র হলো।

কৌশল্যার পুত্রের নাম রাখা হলো রাম। কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার দুই পুত্রের নাম রাখা হলো লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

নিরানন্দ রাজপুরীতে মহা ধূমধাম পড়ে গেল। রাজা দশরথ ধনভাণ্ডার খুলে অকাতরে ধন বিতরণ করতে লাগলেন। সারা রাজ্যে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

[চলবে]

গ্রন্থমেলা

প্রবাস দত্ত

চোখের পলকের মত শীতের বিকেল পড়ে যায়। অথচ বাস থেকে যখন নেমেছিলুম, মনে হচ্ছিল এখনো বিকেল আছে, ভিক্টোরিয়ার প্রাচীন গাছগুলোর চূড়োয়, দিগ-দর্শক মোরগের ঝুঁটির ওপরে রোদ তখনো লেগে ছিল। দু'পা হেঁটে এগোতেই চলে গেল বিকেল। মসৃণ পিচের রাস্তায় শব্দের গুঞ্জন তুলে চোখ ধাঁধানো গতিতে ছুটে যাচ্ছে হাজারটা গাড়ি। গাছের ঝুপসি অন্ধকারে ঘরে ফেরা পাখিদের অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি, অলস মন্থর পায়ে সামান্য কিছু মানুষজন— এখানে ওখানে। কই, সাড়াশব্দ তো পাচ্ছিনে কোথাও অথচ শুনে তো এলাম একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে বই-টই নিয়ে নাকি খুব হই-চই চলেছে!

একটু এগিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কিন্তু অবাক। দু'ভাগে চলেছে এই বই-মেলা। প্রথম মণ্ডপে ঢুকতে কোন দক্ষিণা নেই। সামান্য কিছু লাগল প্রধান মণ্ডপে ঢুকতে। তাকে তাকে সাজান বই। অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, হিন্দী, ইংরিজি, বাংলা—নানান ভাষায় সর্বভারত থেকে প্রকাশিত বই-এর এ এক অফুরন্ত সওগাত। মলাটের কত বাহারী রঙ, কত বিচিত্র ছবি, বিষয় আর আঙ্গিকের কত বৈচিত্র্য! সন্তর্পণে এক একটা বই-এর শরীরে আঙুল ছোঁয়াই, বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। ফুলের ছবি-আঁকা একটা বই-এর প্রথম পৃষ্ঠা সবে উল্টেছি, খুব মৃদু সুরে ভেতরে রবীন্দ্রসংগীতের সুর ছড়িয়ে গেল—বনে কত ফুল ফুটেছে—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শেষ হয়ে গেল যে গ্রন্থ-মেলা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া করেছিল কলকাতায় তার আয়োজন। সর্বভারতে এ-ধরনের প্রচেষ্টা এই পঞ্চম। শুধু ভারত নয়, বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত এক গুচ্ছ বই-ও এই মেলায় প্রদর্শিত হয়েছে। তাদের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে সুট-টাই পরা প্রতিনিধিদের মুখে নির্ভেজাল ঢাকাই-বাংলা উচ্চারণ শুনে আমি পুলকিত হয়েছিলাম। মিষ্টি গলায় মাইকে কে যেন ঘোষণা করলেন, 'বই আপনার বন্ধু'। কে অস্বীকার করবে? সভ্যতার যতই ওপর উঠে যাচ্ছি আমরা, ততই বন্ধু-বিজন হয়ে পড়েছে মানুষ। প্রস্তরযুগ—তাম্রযুগ—ইতিহাসকারদের প্রচলিত আরো নানান যুগের শেষে এল যন্ত্রযুগ। সেই যন্ত্রযুগও এখন নাকি পুরনো। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এ-যুগের নতুন অভিধা—'টেকনেট্রনিক (Technetronic) যুগ'। টেকনোলজিক্যাল আর ইলেকট্রনিক—ইংরিজি এই দুটি শব্দের যুগলবন্দী রূপ। এই বিচিত্র যুগে মানুষের মতন একলা নিঃসঙ্গ শক্তিমান অথচ পরম অসহায় জীব আর কে আছে? তাই তো বই চাই, সই যখন মেলে না। নিঃসঙ্গ শূন্য সময়ের কলস ভরে দিতে বই-এর মতন আর কে পারে? কে পারে আর্ত মানুষকে এর চাইতে বেশি ভরসা দিতে? তামাম দুনিয়ার চিন্তার শরিক করে দিতে বই-এর চাইতে বড় গুরু আর কে আছেন? আমলকীর মতন করতলে পৃথিবীকে এনে দেবার দুঃসাহস বই ছাড়া আর কে কবে দেখাতে পেরেছে?

বই চাই, আরও বই—বই-মেলায় নীরব এই হই-চই! কানে শোনা যায় না, চোখে দেখতে হয়।

অথচ ইউরোপে যখন প্রতি দশ লক্ষ মানুষ পিছু বছরে প্রকাশিত হয় চারশ' আঠারটি বই, ভারতবর্ষে তখন প্রকশিত হয় মাত্র বাইশটি। তবু সংখ্যার বিচার সারা পৃথিবীর গ্রন্থ-প্রকাশ-প্রতিযোগিতায় প্রথম পাঁচটি দেশের

মধ্যে ভারত অন্যতম। আর গোটা পৃথিবীতে যত নিরক্ষর মানুষ বাস করেন, তার অর্ধেকের জন্মভূমি নাকি আমাদের এই ভারতবর্ষ। এ-দেশের শতকরা পঁয়ষট্টিজন মানুষ এখনো অক্ষর চেনেন না।

এ-সব তথ্য মন-খারাপ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে বই-মেলায় পা দিয়ে বই-এর নিবিড় সান্নিধ্যে সে-কথা মুহূর্তে ভুলে যাই। চোখের সামনে বিন্যস্ত বই-এর কাছে প্রজাপতির মত ঘুর-ঘুর করছে মানুষ। পাতা ওল্টাচ্ছে, দাম জেনে নিচ্ছে, মৃদু স্বরে সঙ্গীর সঙ্গে-আলোচনা করছে, ঠোঁটের প্রান্তে হাসি লগ্ন রেখে মানুষেরা এক স্টল থেকে আর স্টলে হেঁটে যাচ্ছে। জানি না, নতুন বই-এর গন্ধে ছোটবেলার গোপন সুখের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কি না কখন কারুর।

গ্রন্থ-জগতে আজকের দিনে ছোটরা মোটেই উপেক্ষিত নয়। এ-কথা বিশেষভাবেই মনে হবে প্রথম মণ্ডপের একটি অংশে শুধুমাত্র ছোটদের জন্যে প্রকাশিত বিভিন্ন বই-এর সাজানো সংসার দেখে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর প্রকাশিত বই-ই শুধু নয় সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার ছোট-বড় অনেক প্রকাশকের বই সেখানে দেখতে পেলাম। রোশনাই ও ঝুমঝুমি দেখতে পেয়েছি, তবে সেটা মূল মণ্ডপে। দেখা পাইনি শুধু তেমন সংখ্যায় ক্ষুদে পাঠকদের। ছোটদের বই-এর মেলায় ছোটরা সকলে থাকলে ছবিটা যেন সম্পূর্ণ হ'ত।

আমার অনেক দিনের ইচ্ছে পাখি সম্পর্কে একটা ভাল বই কিনি। আমাদের চারপাশে কত পাখি, যখন কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রামের গভীরে চলে যাই, ধানের ক্ষেতে, লতা-ঝোপে, গাছের শাখায়, টেলিগ্রাফের তারে কত অচেনা পাখির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাদের নাম জানি না, ঠিকানা জানি না ভাবলেই দুঃখ হয়! বেশ ক'টি ভাল বই-এর সন্ধান পেলাম পাখির ওপর। কিন্তু কেনা হ'ল না। দাম শুনে চুপ করে থাকি। লোভী চোখকে শাসনে আনি। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের গড়পড়তা যা আয়, তাতে এমনিতেই শখ করে বই কেনা এক-রকম বিলাসিতা, দামী বই হলে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করা যেতে পারে। প্রকাশকরা বলেন, স্বল্পমূল্যে বেশি বই প্রকাশের জন্যে চাই বেশি পাঠক, পাঠকদের বক্তব্য, বেশী বই কেনার জন্যে চাই স্বল্প-মূল্যের প্রকাশন। কোনটাই হচ্ছে না। গ্রন্থজগৎ এক পাপ-চক্রের গণ্ডীতে নিঃশব্দে ক্রন্দনরত।

তবু কেউ বসে নেই। নিয়ত অগ্রসরমান আজকের প্রকাশন-শিল্প। প্রচ্ছদে, মুদ্রণে, বাঁধাই-এ, আয়তনে, বিষয়ে ভঙ্গিতে এত বৈচিত্র্য আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মিনি ম্যাক্সি—বই-এর আজকাল কত রকমফের। যেদিকে চোখ ফেরাই অমিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। লেখক একাই শুধু সাধনা করেন না, প্রকাশকের নিষ্ঠাও সাধনার স্তরে চলে যায় কখনো কখনো। লেখক, শিল্পী, মুদ্রাকর, প্রকাশক সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় গ্রন্থজগৎ মানব-সভ্যতার এক চিরকালীন আনন্দ নিকেতন। গুহানিহিত শিলালিপির যুগ পেরিয়ে আত্মপ্রকাশের কোন সীমায় আজ আমরা এসে পৌঁছেছি ভাবলে বিস্ময় লাগে।

কেনা হ'ল না, দেখতে কী দোষ? সাধ মিটিয়ে দেখে নিই বই। সস্নেহে হাত বোলাই। পাখির ছবি দেখে তার গলার সুর শুনি। ফুলের ছবিতে গন্ধ পাই। যে ভাষা বুঝি না, সে ভাষার বই-এর পাতাও উল্টে যাই বিজ্ঞজনের মত। ন্যাশনাল লাইব্রেরী কিংবা কলকাতার আরও অনেক প্রখ্যাত গ্রন্থাগারেও এ-ভাবে তাক থেকে সাজানো গ্রন্থ হাতে তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখার স্বাধীনতা আমাদের আছে, সেখানেও বই-এর মেলা, তবু শীতের সন্ধ্যায় রেকর্ডে রবীন্দ্র সংগীতের মৃদু সুরে আবিষ্ট অনৈসর্গিক এক পরিমণ্ডলে নতুন বই-এর গন্ধ বিধুর সান্নিধ্যে যে বিরল রোমাঞ্চ, এ-গ্রন্থ মেলায় যিনি যান নি, তাকে কেমন করে বোঝানো যায়? ফিরে যেতে যেতে ভাবি: আগামী মাসে কোন কোন খাতে কিছু খরচ বাঁচিয়ে একটি প্রিয় গ্রন্থ আমি কিনব। হ্যাঁ এই আমার অঙ্গীকার: আজ থেকে নিজে আরও পড়ব। আর যিনি কখনো বই পড়েন না, তাঁকে বলব --পড়ুন! কেননা কোন বয়সেই বই পড়ার পক্ষে বেশী বয়েস নয়।



নারায়ণ চক্রবর্তী

॥ সাত ॥

তাঁর নিজের অসাবধানতার জন্যই নকশাটি চুরি হয়েছে বুঝতে পেরে কর্নেল দত্তর দুঃখের আর সীমা রইলো না, তবু দুর্বলভাবে একবার বললেন—"কিন্তু এ ঘরে লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা কোথায় মিস্টার লাহিড়ী ?"

"একটিমাত্র জায়গাই তো চোখে পড়ছে কর্নেল, যে জায়গাটাই পর্যবেক্ষণ করা যাক—"বলে হঠাৎ মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল বসন্ত। হামা দিয়ে এগিয়ে গেল কর্নেল দত্তর সিঙ্গল বেড খাটের দিকে।

অবাক হয়ে ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত লক্ষ্য করলেন যে কর্নেলের খাটের নীচে মাথা ঢুকিয়ে তার অন্ধকার তলদেশে টর্চের আলো ফেলেছে চীফ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্টার বসন্ত লাহিড়ী।

উদ্বেগভরা কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল, তারপর এদিকে মুখ ফিরিয়ে বসন্ত বলল,—"হুম্,—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।"

কাছে গিয়ে তার পাশে উবু হয়ে বসলেন ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত, বললেন,—"কী ভেবেছিলেন লাহিড়ী ?"

"বলছি। কর্নেল দত্ত, একবার আসুন তো এখানে,—ওদিকে তাকান, কী দেখছেন ?"

অনেক কষ্টে তাঁর শালগাছের মতো লম্বা, সরল দেহখানা গুটিয়ে এনে বসন্তর পাশে হামা দিয়ে বসলেন কর্নেল দত্ত, বসন্তর আঙুল সোজা তাকালেন।

ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্তও তাকালেন।

বসন্তর হাতের টর্চের আলোতে দু'জনেই দেখলেন যে বহুদিন ধরে ঝাঁট না দেবার ফলে খাটের নীচে ধুলোর একটা পুরু আস্তরণ পড়েছে, কিন্তু ঠিক মাঝামাঝি জায়গার অনেকটা অংশ বেশ পরিষ্কার, ধুলো নেই সেখানে।

কিছুই বুঝতে না পেরে কর্নেল আর বিগেডিয়ার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

গম্ভীর ভাবে বসন্ত বলল,—"আপনার এই শোবার ঘর ঝাড়পোঁছ কে করে কর্নেল ?"

এই অচিন্ত্যনীয় প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেলেন কর্নেল দত্ত। বললেন,—"মহাবীর সিং,—কেন বলুন তো মিস্টার লাহিড়ী ?"

"তাকে পাঁচ টাকা ফাইন করুন আর দশ টাকা বকশিশ দিন—"

বসন্তর এই উদ্ভট কথা শুনে হাসবেন না কাঁদবেন তা ভেবে পেলেন না কর্নেল দত্ত।

যে ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত বসন্তর কার্যপ্রণালীর সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন, তিনি পর্যন্ত চটে গেলেন বসন্তর কথা শুনে। বললেন,—"এ কথার মানে কি লাহিড়ী ?"

মুচকি হেসে বসন্ত বলল,—"মানে কাজে অবহেলার জন্য ফাইন আর সেই অবহেলার জন্যই নকশা চোরের খাটের নীচে লুকিয়ে থাকার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হ'ল বলে বকশিশ—"

"আর একটু খুলে বলুন লাহিড়ী—"

"খুলে বলব ? আচ্ছা শুনুন তা হলে। মহাবীর যেমন তেমন ক'রে ঘর ঝাঁট দেয়, তাই খাটের নীচে প্রচুর ধুলো জমে আছে। ঐ ধুলো খাটের নীচে সমস্ত জায়গাতেই সমানভাবে ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে মাঝখানটা বেশ পরিষ্কার। কেন ? কারণ নকশা চোর ঠিক ও জায়গাটাতেই লুকিয়ে বসে ছিল আর সে জায়গার সমস্তটুকু ধুলো তার জামা কাপড়ে লেগে উঠে গেছে।"

আর একবার বসন্তর হাত চেপে ধরলেন ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত। ব'লে উঠলেন,—"চমৎকার লাহিড়ী, চমৎকার বিশ্লেষণ। এ ব্যাপারটা তো আমাদের মাথাতেই আসে নি, কী বলেন কর্নেল ?"

নকশা চোর যে একেবারে তাঁরই শোবার ঘরে খাটের নীচে লুকিয়ে বসে ছিল, এ তথ্যটা প্রমাণিত হওয়ার ফলে কর্নেল দত্তর মুখখানা রাগে, অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে থমথম করতে লাগল।

হঠাৎ ব'লে উঠলো বসন্ত,—"আপনার ঝাঁটাটা কোথায় কর্নেল ?"

"ঝাঁটা ?" যেন আকাশ থেকে পড়লেন কর্নেল দত্ত।

"হ্যাঁ ঝাঁটা। ঘর ঝাঁট দেবার ঝাঁটা—"

"কী জানি। বারান্দায় আছে হয়তো—"

বারান্দায় গিয়ে কোনে রাখা ফুল ঝাঁটাটি নিয়ে এলো বসন্ত। খাটের কাছে উবু হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে খাটের নীচের সবটুকু ধুলো ঝাঁটা দিয়ে টেনে নিয়ে এলো বাইরে। তারপর পকেট থেকে তার ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বার ক'রে জড়ো করা স্তূপ ধুলো ঘেঁটে কী যেন দেখতে লাগলো সে। মিনিট তিনেক পরে ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত লক্ষ্য করলেন যে বসন্তর মুখে সাফল্যের আলো পড়েছে। এক টুকরো সাদা কাগজের ওপর ধুলো থেকে কী যেন তুলে রাখলো সে।

কর্নেল দত্ত এগিয়ে এসে কাগজটার খুব কাছে মাথা এনে দেখলেন যে আহামরি কিছু নয়, গোটা কয়েক ছোট ছোট চুল।

সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন কর্নেল দত্ত,—"এ কী ব্যাপার মিস্টার লাহিড়ী ? গোটা কয়েক চুলের পেছনে মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন আপনি ?"

"শুধু চুলই নয় কর্নেল,—খসে পড়া খুস্কিও আছে,—সাদা চোখে দেখতে পাবেন না,—আমার এই ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখুন—ব'লে ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা কর্নেল দত্তর দিকে বাড়িয়ে দিল বসন্ত।

কর্নেল দত্ত তা ছুঁয়েও দেখলেন না, একটু চড়া গলাতেই বললেন,—"এ সব ছাই ভস্ম দেখে সময় নষ্ট না ক'রে নকশা-চোরটাকে ধরবার চেষ্টা করলে ভালো হ'ত না ?

"সেই চেষ্টাই তো করছি কর্নেল। যাকে আপনি ছাই ভস্ম বলছেন সে-ই যে আমাদের নিয়ে যাবে নকশা-চোরের কাছে,—কথায় বলে ঃ

'যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে
অমূল্য রতন।'

"তার মানে ? কী বলতে চান আপনি ?" এবার যেন একটু চটেই উঠলেন কর্নেল দত্ত। ঘরখানা তাঁর গলার আওয়াজে গমগম ক'রে উঠলো।



তার মানে ? কী বলতে চান আপনি ?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাঝে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত, বললেন,—"লাহিড়ী কিন্তু না ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করে না কর্নেল। তার তদন্ত পদ্ধতি চলে একেবারে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রথাতে,—ওকে নিজের মতে চলতে দিন, কাজ হবে তাতে।"

"কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পাচ্ছি কোথায় ব্রিগেডিয়ার ?" গজগজ করতে করতে কর্নেল দত্ত বললেন,—"চুল, মাথার খুস্কি, এ সব দিয়ে কী হবে ?"

বসন্তর গলায় যেন পাখোয়াজ বেজে উঠলো, বলল,—"এরা আমাকে নকশ-চোর সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু বলেছে কর্নেল,—আপনি বাধা না দিলে আরও অনেক তথ্য জানাবে।"

"বটে!" শ্লেষের সঙ্গে কর্নেল দত্ত বললেন,—"কী কী বলেছে বলুন তো শুনি—"

ততক্ষণে পকেট থেকে ম্যাগনিফায়িং মাইক্রোমিটার বার ক'রে চুলের দৈর্ঘ্য মেপে নিয়েছিল বসন্ত। বলল,—"চুলগুলো গড়ে এক দশমিক নয় ছয় সেন্টিমিটার লম্বা—"

"হোক না, কী হয়েছে তাতে– "

"তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নকশা-চোর পুরুষ এবং দিন সাতেকের মধ্যে চুল ছেঁটে এসেছে সেলুন থেকে। আরও জানা যাচ্ছে যে সে একটু শৌখীন প্রকৃতির লোক, কেন না জবাকুসুম তেল মাখে সে। চুল-ওঠা রোগ আছে তার, আর আছে মাথাভরা খুস্কি।"

বসন্তর কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না কর্নেল দত্ত। তাই বেশ একটু বিদ্রূপ-মেশা সুরেই ব'লে উঠলেন—"শার্লক হোম্‌স বা এরকিউল পঁয়রোর মতো কতগুলো মন গড়া কথা তো বেশ ব'লে যাচ্ছেন দেখছি। কিন্তু তার মধ্যে কতটুকু খাঁটি আর কতটুকুই বা ভেজাল, তা জানা যাবে কি ক'রে মশাই?"

স্মিত হেসে বসন্ত বলল,—"ধরুন না যে সবগুলোই খাঁটি!"

"বটে! তার প্রমাণ?"

"প্রমাণ? চুলগুলো লম্বায় গড় পড়তা এক দশমিক নয় ছয় সেন্টিমিটার লম্বা ব'লে বলেছিলাম। এই নিন আমার মাইক্রোমিটার,—মেপে দেখুন"—

"আহা, এটা তো ঠিকই আছে, অন্যগুলোর প্রমাণ পেশ করুন—"

"মানে জবাকুসুম তেলের কথাটা? দেখুন কর্নেল, আমার ঘ্রাণশক্তিটা বরাবরই একটু বেশী রকম তীক্ষ্ণ। গোয়েন্দাগিরির পেশায় এসে ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে তা তীক্ষ্ণতর হয়েছে। চুলগুলো ম্যাগ্‌নিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখার সময়ে আমি তা থেকে জবাকুসুম তেলের গন্ধ পেয়েছি। নাকের কাছে নিয়ে নিবিড় ভাবে শুকলে আপনিও পাবেন নিশ্চয়ই। দেখুনই না একবার পরীক্ষা ক'রে"—ব'লে কাগজে রাখা চুল কর্নেল দত্তর নাকের কাছে তুলে ধরল বসন্ত।

জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে কুণ্ঠিত ভাবে জবাকুসুম তেলের গন্ধের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেন কর্নেল দত্ত,—"হ্যাঁ, গন্ধটা ও রকমই বটে!"

খুশী হয়ে বলতে লাগল বসন্ত,—"লোকটা যে অল্পদিন আগে সেলুনে চুল ছেঁটেছে তা বুঝলাম কি-ক'রে জানেন কর্নেল? এক নম্বর হ'ল চুলের সাইজ। প্রায় দুই সেন্টিমিটার লম্বা চুল কখন থাকে মাথায়? নিশ্চয়ই সদ্য চুল ছাঁটার পর। দু'নম্বর হ'ল চুলের শেপ্‌ বা প্রকার। আমার এই শক্তিশালী ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটা দিয়ে দেখুন, চুলগুলোর সরু দিকটা, মানে আগার দিকট কি রকম ধারালো। চুল ছাঁটার পর পরই চুলের অবস্থা ঐ রকম থাকে।"

বসন্তর বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে কর্নেল দত্ত থ' মেরে যাচ্ছিলেন আর ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত শুধু মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে বসন্ত বলল,—"এবার চুল ওঠা রোগের আর মাথায় খুস্কি থাকার কথাটি কি ক'রে বুঝলাম তা বলছি। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে চুলগুলোর গোড়ার দিকটা দেখুন, দেখবেন যে প্রত্যেকটি চুলের গোড়াতেই একটা মোটা সাদা অংশ লাগানো আছে, ওগুলো চুলের বাল্‌ব্‌, চুল খসার সময় বাল্‌ব্‌ নিয়েই খসে পড়ে। চুল আর ধুলোর সঙ্গে মাথার মরা মাস বা খুস্কিও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ নকশা-চোর খাটের নীচে বসে থাকার সময়ে মাথায় খুস্কি থাকার দরুন মাথা চুলকে ছিল, আর তার ফলেই মাথা থেকে মরা খুস্কি আর চুল মেঝের ওপর খসে পড়েছে।"

[চলবে]

তোমাদের পাতা



মানসী সেনগুপ্ত (বয়স-৮)

সার্কাসের বাঘ

দেবকুমার গড়গড়ি

কাগজের পাতাটা ওলটাতে ওলটাতে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো বাঘ ভায়া। বারবার চোখ বোলাতে লাগলো সেই জায়গাটায়—'ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাস। ওই সার্কাসেই তো এসেছে তার মামা, এই তো তাঁর ছবি।

বাঘের আনন্দ আর ধরে না। সার্কাস তাকে দেখতেই হবে। না হলে মামা কি মনে করবেন। ভাবতে লাগলো বাঘ। খুশী খুশী মন নিয়ে কোট প্যাণ্ট পরে বেরিয়ে পড়লো বাঘ কলকাতার রাস্তায়।

মনের আনন্দে এসে পৌঁছলো বাস ডিপোয়। উঠলো দোতলা বাসে। কী ভিড় রে বাবা! দম আটকে যাবার যোগাড়। ঠেলাঠেলি দাপাদাপি কি বুড়ো বয়সে পোষায়? বিড়বিড় করে বকতে লাগলো বাঘ। কি আর করে সে, বাদুড়ের মতো ঝুলতে ঝুলতে চললো সার্কাসের ময়দানে।

বাস থেকে নামতেই চমকে উঠলো বাঘ। ওরে বাবা, এত লোক এলো কোথা থেকে। এত আলোই বা পেলো কোত্থেকে। মৃদু স্বরে বলতে লাগলো বাঘ। মনে মনে ভাবলো সে, কেনই বা হবে না শুনি? তার মামার কথা মনে পড়তেই বুকটা ফুলে ৩২ ইঞ্চি হয়ে গেলো বাঘের। সিগারেট ফুকতে ফুকতে ঢুলকি চালে চললো বিরাট লাইনের পাশ দিয়ে। আর মাঝে মাঝে টিনে আঁকা বাঘের ছবির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে লাগলো।

গেটের সামনে আসতেই শুনতে পেলো সে—দাদা টিকিটটা। মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দেয় বাঘ—টিকিট আবার কিসের হে? হ্যাঁ-হ্যাঁ টিকিট, সার্কাস দেখার টিকিট—রাগত স্বরে বলে গেটকিপার। মুখের ধোঁয়াটা ছেড়ে বাঘ বললে, টিকিট? আচ্ছা কাল মাইনে পাবো, তখন নিয়ে নিও! এই

বলে ঢুকতে গেলো তাঁবুর ভিতর। টিকিট দিন, না হলে খুব খারাপ হবে বলছি।—চেঁচিয়ে ওঠে গেটকিপার। বাঘও উত্তর দেয়—আরে মশাই, মামা এখানকার মস্ত খেলুড়ে, ওই দেখুন তার ছবি। এই বলে সোজা ঢুকে গেলো তাঁবুর ভেতর।

সবাই অবাক! কি জানি বাবা, হতেও পারে।

ছড়ি দোলাতে দোলাতে লাটসাহেব এসে বসলেন প্রথম শ্রেণীর আসনে। তখন তাঁর কী আনন্দ! ঘন ঘন লোক আসতে লাগলো তাঁর কাছে।

এইভাবে একটার পর একটা খেলা দেখতে লাগলো। আর অপরের দেখাদেখি সেও হাততালি দিতে লাগলো·খেলার সাথে সাথে। কিন্তু তার মামা তো এলো না এখনো। মনে হয় জ্বর-টর হয়েছে। যা ঠাণ্ডা-গরম, বোধহয় ডাক্তারখানায় গেছে। এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেয় বাঘ ভায়া। এইভাবে আরো অনেক কিছু দেখতে লাগলো মনের আনন্দে। কিন্তু হঠাৎ তাঁবুর এক কোণে বিরাট গাড়ি দেখতে পেলো সে, কত লোক তাকে ঠেলে আনছে। গদগদ হয়ে পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা মশাই, বলতে পারেন ওটা কিসের গাড়ী? বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় পাশের ভদ্রলোক—ওটা হচ্ছে বাঘের গাড়ী। দেখুন না বাঘ মশাই কেমন নামছে।

সত্যি তো! মামাকে দেখা মাত্র লাফিয়ে উঠলো সে। চিৎকার করে বলে—মামা, টুকি।

দূর থেকে ভাগ্নেকে অভিনন্দন জানায় মামা।

এদিকে মুশকিল, মামা আজ খেলা কিছুতেই দেখাবে না। কারণ আজকে তার আহারটা খুব ভালো হয়নি। তাই মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে।

সার্কাসের ম্যানেজার রেগে গিয়ে মারলো এক চাবুক। ব্যাস, আর যাবে কোথায়, লাফিয়ে উঠলো বাঘ, ছুটে গিয়ে কলার চেপে ধরলো ম্যানেজারের। বললে, কি এতো বড় আস্পর্ধা তোর? ভাগ্নের সামনে মামাকে মারা? এই বলে এক চড় কষিয়ে দিলো তাঁর গালে। ম্যানেজারও ছাড়বার নয়, সেও চালিয়ে দেয় এক ঘুষো। ব্যাস, বেধে গেলো মারামারি। গুঁতোগুতির ফলে কোট প্যান্টের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেল লম্বা লেজখানা।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে শুধু চিৎকার—কে কোথায় আছো, পালাও, তাঁবুতে বাঘ পড়েছে। চারিদিকে শুধু পালিয়ে যাবার দুপদাপ শব্দ। আর প্রহরীরা বর্শা এনে বেঁধে ফেললো বাঘকে। কিছু না বলে তাকে অন্য একটা খাঁচায় দিলো পুরে। কারণ কিছুদিন আগে তাদের একটা বাঘ নিমোনিয়ায় মারা গিছলো।

তোমরা যদি এখনো যাও, তা হলে নিশ্চয় মামা ভাগ্নের খেলা দেখতে পাবে। ভাগ্যিস, একটা বাঘ মারা গিছলো, না-হলে বাঘ ভায়ার যে সেদিন কি অবস্থা হতো তা সেই জানে।

ভুঁড়িদাস
বিবেক রায়

দশ হাত ভুঁড়ি তার
মেপে দেখ একবার,
ডাক্তারে দেখে বলে
ওটা কাটা দরকার।

দশ হাত ভুঁড়ি নিয়ে,
নাজেহাল 'ভুঁড়িদাস',
'ভুঁড়িহীন' হলে যে গো
হবে তার সর্বনাশ।

শিল্পী
সর্বজিৎ সেন

দেখো দেখো ওই লোকটাকে,
তুলি দিয়ে কত ছবি আঁকে।
তুলি দিয়ে টানে দুটো টান।
হয়ে যায় ধনুক ও বাণ!
দুটো টান দিয়ে খুব খুশী।
কারণ সে এঁকেছে যে পুষি।
কখনো কখনো ধরে তুলি।
এঁকে দেয় এক জন কুলী।
কুলীর মাথায় দেয় মোট।
গায়ে এঁকে দেয় ছেঁড়া কোট।
যখন আসে না তার প্ল্যান
আঁকিবুঁকি কাটে হেনতেন।
তুলিখানা করে চর্বণ।
পাশে বসে দেখে চার বোন।



'দুটিমাত্র স্ফটিক স্বচ্ছ জানালা সেই জলজগৎ থেকে আমাদের পৃথক করে রেখেছিল। ...চতুর্দিকে এক মাইল পর্যন্ত সমুদ্রজল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কী অপূর্ব দৃশ্য! কোন ছার কলম তার বর্ণনা দেয়!... বিস্ময়ে হারিয়ে গিয়ে আমরা অবাক হয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ...পুরো দু'ঘন্টা ধরে যেন জলপ্রাণীদের এক বিরাট সেনাদল সঙ্গে চলল। তাদের খেলা আর হুল্লোড়ের মাঝে, যখন তারা সৌষ্ঠব আর গতিতে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল, আমি অনেকগুলিকেই চিনতে পারলাম।'

উপরের বর্ণনাটি যাদের পড়া আছে তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে ফরাসী সাহিত্যিক জুলে ভের্নের লেখা বই 'সাগর জলের নীচে কুড়ি হাজার লীগ' (ইংরিজীতে 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্স্ আণ্ডার দ সী') বইটির কথা। ডুবোজাহাজ নটিলাস, ক্যাপ্টেন নিমো আর সেই সব অদ্ভুত নাবিকদের কথা। একমাত্র ডুবোজাহাজে করেই সাগর জলের নীচেকার অমন অত্যাশ্চর্য জগতের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে—নয় কি? সেই অপরূপ সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলী দর্শনের জন্য আজকাল অবশ্য শুধু ডুবোজাহাজ নয়, বাথিস্ফিয়ার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়েছে। শুধু সাগর জলেই নয়। হ্রদ, নদী, এমন কি আমাদের আশে পাশের পুকুর জলাশয়ে রয়েছে 'জলজ জগৎ।'

এই জগতের পরিচয় পাওয়া যেমন আনন্দের, তেমনই উত্তেজনার। 'অ্যাকোয়া লাঙ (উদ্ফুসফুস)' বা অক্সিজেন মুখোশ এঁটে ব্যাঙ সাঁতারু হয়ে জলের নীচে ঐ সব জগৎ ঘুরে ঘুরে দেখা চলে ডুব সাঁতারে। ইউরোপ, আমেরিকায় এভাবে কত শতজন শখের ডুবুরী জলজ প্রাণী মাছ, ব্যাঙ, পোকামাকড় আর গাছপালা দেখে বেড়াচ্ছেন। বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় সে সবের ছবিও তুলে আনছেন। বাঁশ বা ধাতুর ছিদ্রহীন একটি লম্বা নল মুখে নিয়ে তার উপর দিকটা জলের বাইরে জাগিয়ে রেখে জলের ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস চালানো যায়। চোখে জল আটকানো বড় চশমা এঁটে এভাবে পরিষ্কার জলাশয়ে কিছুদূর গভীরতা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চালানো যায়। কলকাতার দোকানে অনেক চশমা কিনতে পাওয়া যাবে। আমরা অবশ্য পরিষ্কার পুকুরে ডুব সাঁতার দিয়ে দু-এক মিনিট কাটিয়েছি আর মজাদার সব দৃশ্য দেখেছি।

জলের নীচে পর্যবেক্ষণ আর ছবি তোলা এক উপভোগ্য খেলা। কিন্তু আমাদের যাদের অত দূর সামর্থ্য নেই, সময় বা সুযোগ নেই, তাদের কি ব্যবস্থা! আচ্ছা ঐ জলের জগৎটাকে মাটির উপর ঘরের মাঝে টেনে আনলে কেমন হয়? কেন হবে না? বাগানের, বনের গাছকে যদি ঘরের ছাতে, পড়ার টেবিলে পাততে পারি জলের মাছকে নয় কেন?

আর তাই-ই তো করা যায় একটা কাচ ঘেরা মাছের চৌবাচ্চা বা অ্যাকোয়ারিয়াম বানিয়ে দিয়ে। এতে শুধু যে ঐ জগৎটার একটা অংশ চোখের সামনে তুলে আনা চলবে তাই নয়, একটা নতুন জগৎ সৃষ্টির আনন্দ,

জেনো অজানা

—বিজ্ঞানার্থী

বিশ্বকর্মার আনন্দে মনটাকে ভরিয়ে নেওয়া চলবে। কেউ কেউ মাছ পোষার সঙ্গে খাঁচায় পাখী পোষার তুলনা করে বলেন—ওটা বিশ্রী—খুব খারাপ। আসলে তা কিন্তু মোটেই নয়। অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলো কম জলে থাকতে অভ্যস্ত। ছোট চৌবাচ্চায় কোন কষ্টই হয় না। অবশ্য যদি আমরা কষ্ট না দি। তাছাড়া মাছগুলো অনেক ছোট। এমন কি এ সব মাছের বহু শুধুমাত্র অ্যাকোয়ারিয়ামে পোষবার জন্য মানুষেরই সৃষ্টি। তাদের বড় জলায় রাখা বিপজ্জনক। সেখানে এত শত্রু যে প্রাণ বাঁচানোই দায়।

আমরা যারা শখে শখে মাছ পুষি তাদের সর্বদা বিশেষজ্ঞদের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। বিশেষজ্ঞরা পণ্ডিত মানুষ। কেবল মাছ বিষয়েই তাঁরা পড়াশুনা, গবেষণা, খোঁজখবর করেন। এই সব মেছো বিজ্ঞানীদের বলা হয় 'ইকথিওলজিস্ট।' বাংলায় বলতে পারি 'মৎস্যবিদ।' ইকথিওলজির অর্থ মৎস্যবিজ্ঞান।

একজন ইকথিওলজিস্ট বলেছেন, সমস্ত পৃথিবীটাই মানে যেখানে যত জলা আছে, সবই তাঁর অ্যাকোয়ারিয়াম। তা সত্ত্বেও তাঁর বাড়িতে নিজের হাতে তৈরী ছোট্ট অ্যাকোয়ারিয়ামটির পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে যে আনন্দ পান তার তুলনা নেই। সত্যি বলতে কি মাছ পোষার মত শখ খুব কমই আছে।

হবির রাজা যদি হয় ডাকটিকিট সংগ্রহ, হবির রাজপুত্তুরটি তাহলে ফুলের বাগান করা। আর হবির রাণী হ'ল 'আকাশ পর্যবেক্ষণ।' কিন্তু মাছ পোষার শখকে বলতে পারি হবির 'রাজকন্যা।'

কি? তাহলে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরীই সাব্যস্ত হ'ল তো! চলো এখন উঠে পড়ে লাগা যাক। প্রথমতঃ চৌবাচ্চা। কাচের অ্যাকোয়ারিয়াম হয় দু' ধরনের। এক নম্বর—আগাগোড়া কাচের যে কোন পাত্র এমন কি একটা বয়েমে বা হরলিকসের শিশিতেও কাজ চলতে পারে। এমন পাত্র অবশ্য খুব ভাল নয় আর বেশী বড়ও হয় না। অন্য রকম হ'ল লোহার পাতের ফ্রেমে বসানো কাচের দেওয়াল দেওয়া চৌবাচ্চা। এ রকম চৌবাচ্চা কিনতে পাওয়া যায় দোকানে। নানা রকম মাপে এমন কি অর্ডার দিয়ে ইচ্ছামতো মাপে তৈরীও করানো যায়। এক ফুট লম্বা, দশ ইঞ্চি চওড়া, নয়-দশ ইঞ্চি উঁচু চৌবাচ্চার দাম বারো থেকে পনেরো টাকা। দেড় ফুট লম্বার দাম আঠারো থেকে বাইশ টাকা। দু' ফুটের দাম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা আর আরও বড় হলে একশ, দেড়শ বা বা দুশ টাকার মত। প্রথম প্রথম শুরু করবার পক্ষে দেড় ফুট বা দু'ফুট মাপের চৌবাচ্চাই ভাল। অবশ্য তারও আগে কাচের বয়েমে পুঁটি বা খলশে মাছ পোষা উচিত।

মজাটা আরও হয় যদি চৌবাচ্চাটাও তৈরী করে তোলা যায়।

আমার কিছু ক্ষুদে বন্ধু তাদের বাড়িতে দেওয়ালের তাককে অ্যাকোয়ারিয়াম বানিয়ে ফেলেছে। সামনে একটা কাচ সিমেন্ট করে বসিয়ে নিয়ে। আরেক দল একটা টিনের বাক্স কেটে চারদিকে চারটে কাচ বসিয়ে নিয়েছে। লোহার ফ্রেমে কাচ বসাবার জন্য বিশেষ ধরনের আঠা কিনতে পাওয়া যায়।

(আগামীবারে শেষ হবে)



খেলা আর খেলা

ক্রিকেট-রাবার ভারতের হাতে

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কলকাতার ইডেনে আমাদের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকর ও ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি লুইস টস করছেন।

এই লেখা যখন লিখছি তখন বোম্বাই-এর ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ভারত আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে চলছে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচ ; এই খেলার ফলাফলের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে ইংল্যাণ্ড দলের মান সম্মান ! কারণ এই খেলায় জিততে পারলেই এই সিরিজের ফলাফল হবে সমান সমান ; তবে তাতেও 'রাবার' থেকে যাবে ভারতের হাতে ! কারণ এর আগের সিরিজে ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই তো আমরা জিতে এসেছি ; সে জয়ের ফলে 'রাবার' এসে গেছে আমাদের হাতে। এখন সিরিজের ফলাফল ড্র হলেও তাই আমরা সে 'রাবার' হারাচ্ছি না !

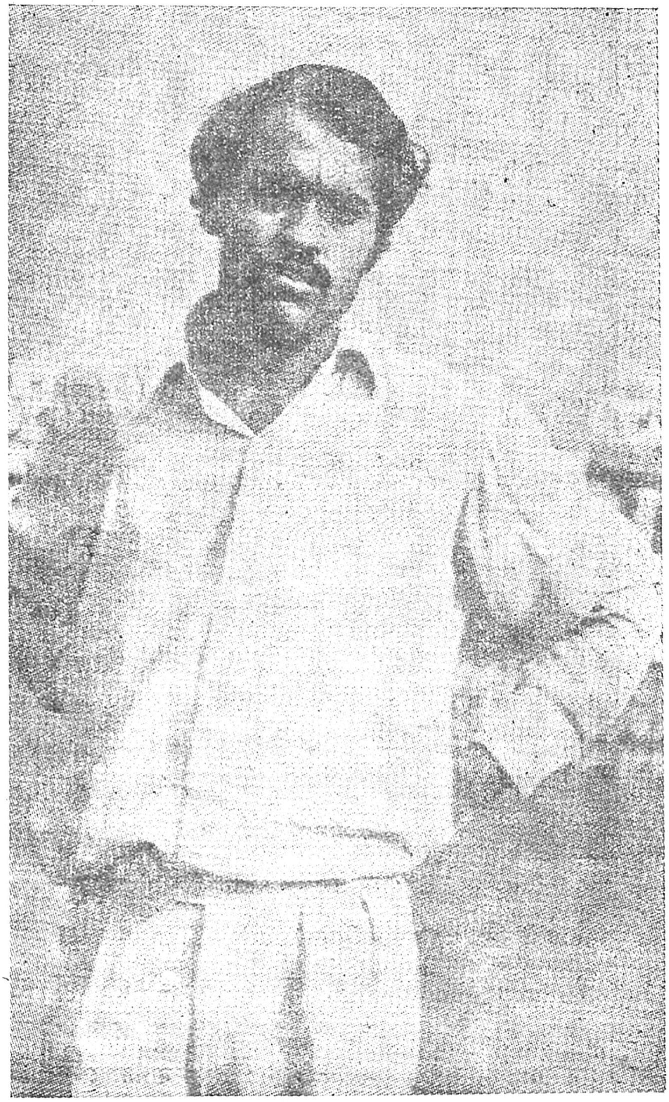
বোম্বাই-এর প্রথম দিনের খেলায় ভারতের উইকেট রক্ষক ইঞ্জিনিয়ারের অনবদ্য শত রান এই সিরিজে ভারতের খেলোয়াড়দের করা প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী ; অবশ্য এর আগের টেস্টে কানপুরের গ্রীন পার্কে ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক টনি লুইস যে শত রান করেছিলেন সেটাই এই সিরিজে উভয় দলের মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরি। বোম্বাই টেস্টের প্রথম ইনিংসে আরও তিনজন সেঞ্চুরি করে ব্রেবোর্নে ব্যাটস্‌ম্যানদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রমাণ করে দিয়েছেন। ভারতীয় দলের গুনডাপ্পা বিশ্বনাথ প্রথম তিনটি টেস্টে তেমন ভালো খেলতে না পারলেও কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে হাত খুলে খেলে অপরাজিত ছিলেন ৭৫ রানে। সেই বিশ্বনাথই বোম্বাই এর শেষ টেস্টে করলেন শত রান। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলাতেই অমরনাথ, দীপক সোধন, হনুমন্ত সিং, আব্বাস আলি বেগ প্রমুখ কয়েকজন সেঞ্চুরি করেছেন। তাঁদের পাশে ছোটোখাটো এই ছেলেটির নামও লেখা আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্বনাথ ছাড়া ঐ সমস্ত বিখ্যাত ক্রিকেটারদের আর কেউই দ্বিতীয় টেস্ট

সেঞ্চুরির গৌরব লাভ করতে পারেননি। সেদিক থেকে মহীশূরের এই তরুণ খেলোয়াড়টি এক নতুন রেকর্ড করলেন।

বলা চলে বোম্বাই টেস্টে রেকর্ডের ছড়াছড়ি! যেমন, ইঞ্জিনিয়ার ও ওয়াদেকারের দ্বিতীয় উইকেটে জুড়ি বেঁধে ১৯২ রান ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে **নতুন** রেকর্ড! এর আগের রেকর্ড ছিল এই দুজনেরই—১৯৬৭ সালের লীড্‌স টেস্টে ১৬৮ রানের। এরপর পঞ্চম উইকেটে জুটি বেঁধে ইংল্যাণ্ড দলের সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড় হাসিখুশি টনি গ্রিগ্‌ আর কীথ ফ্লেচার ১৮৩ রান করলে ইংল্যাণ্ডের আরও একটা টেস্ট রেকর্ড ভাঙে! এর আগে ভারতের বিপক্ষে এই দলের পঞ্চম উইকেট জুটিতে রেকর্ড রান ছিল ১৮২! ১৯৪৬ সালের লর্ডস টেস্টে এই রান করেছিলেন গিব্‌ আর হারডস্টাফ্‌! এইখানেই শেষ নয়। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় এতকাল যে কোন দেশের পঞ্চম উইকেটে সর্বোচ্চ রান ছিল ২২৩। মেলবোর্ণে এই রান করেছিলেন ব্রাডম্যান আর মরিস; সেই ১৯৪৭-৪৮ সালের টেস্ট সিরিজে। গ্রিগ আর ফ্লেচার এবার ব্রেবোর্ণে সে রেকর্ডও ভাঙলেন!

এই খেলায় ২১১ মিনিটে ১৭টি চারের সাহায্যে টনি গ্রিগের শত রান এই সিরিজের দ্রুততম সেঞ্চুরি! এঁরা যেন রেকর্ড ভাঙার জন্যেই খেলতে নেমেছিলেন; কারণ গ্রিগ ও ফ্লেচার আরও একটি নতুন রেকর্ড করে করেছেন রেকর্ডের হ্যাটট্রিক! এই জুটি ২৪৩ রান করলে যে কোন দেশের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম উইকেট জুটির সেটাই হয় সর্বোচ্চ রান! এর আগে ১৯৩৩ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হ্যামণ্ড আর এমস্‌ করেছিলেন ২৪২ রান!

॥ সিরিজে সবচেয়ে বেশী উইকেট যার দখলে ॥



ভাগবত চন্দ্রশেখর



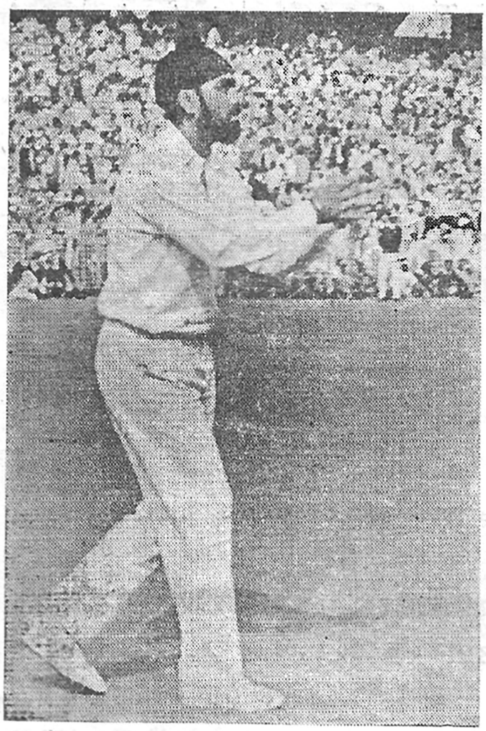
সবার প্রিয় টনি গ্রিগ

বোম্বাই টেস্টে আরও একটা ছোট্ট রেকর্ড হবার সম্ভাবনা আছে; সে রেকর্ড করতে পারে সোলকার! ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা টেস্ট সিরিজে তার মত এত ক্যাচ আর কেউ ধরতে পারে নি। আর ৩টে ক্যাচ ধরতে পারলেই হবে তার বিশ্ব রেকর্ড! সেই সঙ্গে বোলার হিসাবে চন্দ্রশেখরও একটি সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট পাবার (ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে) রেকর্ড করতে পারে। যদি সে আর একটা উইকেট পায় ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে।* বোম্বাই টেস্টে তাই বলা চলে রেকর্ডের ছড়াছড়ি! কিন্তু নিষ্প্রাণ উইকেটের জন্যে বোম্বাই টেস্ট শেষ পর্যন্ত এই সিরিজের সব থেকে আকর্ষণীয় টেস্ট হয়ে উঠবে কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ যেমন মন্থর গতিতে রান উঠছে তাতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হওয়া খুবই কঠিন! খেলা শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র হবারই সম্ভাবনা। অনিশ্চয়তায় ভরা আকর্ষণীয় ক্রিকেট দেখবার সুযোগ বরং পেয়েছে এবার কলকাতা আর মাদ্রাজের দর্শকেরা। কলকাতা টেস্টে যে আমরা জিতবো এমন ধারণা শেষ দিনেও করতে পারেননি অনেকে। বরং ভারতের হার দেখতে হবে এই আশঙ্কায় শেষ দিন খেলাই দেখতে যাননি কেউ কেউ। অথচ সেই খেলায় ভারতের বোলাররা জয় ছিনিয়ে আনলো শেষ মুহূর্তে! মাদ্রাজ, কানপুরেও আমরা এই রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছি!

আপাতত এই সিরিজের খেলা দেখে আমার মনে যে কয়েকটা আশঙ্কা জেগেছে তা' তোমাদেরও জানিয়ে রাখতে চাই। প্রথমেই আমার মনে হয়েছে ভারতের বোলারদের অমানুষিক পরিশ্রমের কথা; জয়ের জন্যে আমাদের দল বড্ড বেশি করে বেদী, চন্দ্রশেখর ও প্রসন্নের ওপর নির্ভর করেছে। তাদের বড্ড বেশি খাটিয়েছে। তাদের ঘাড়ে কঠিন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি আমরা। যদিও এরা তিনজনই বিশ্বের তিন সেরা স্পিনার, তবু এদের বলের ধার আনবার জন্যে একজন ভালো পেস বোলার এদের পাশে রাখা চাই। তবেই এদের বল আরও খুলবে। এবার ক্রিকেট খেলার সেরা বর্ষপঞ্জী 'উইজডেন' চন্দ্রশেখরকে বিশ্বের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটারের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছে। তবু একমাত্র তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ বোম্বাই ও কানপুর টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটধারীরা যে ভাবে তার বল খেলেছে তাতে বোঝা যায় চন্দ্রশেখরের বহুল ব্যবহার ভবিষ্যতে হয়তো কাম্য হবে না। এছাড়া গাভাসকার মনসুর আলি বা সোলকারকে দিয়ে বল ওপ্‌ন করার প্রহসন অবিলম্বে বন্ধ

দরকার শারীরিক যোগ্যতা। ইংরাজীতে যাকে বলে ফিজিক্যাল ফিটনেস! আমাদের কয়েকজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ঐ জিনিসটির অভাব চোখে পড়লো।

কিন্তু এবার এই পর্যন্ত! পরের বার লিখবো অন্য বিষয়ে।



খেলা শুরুর আগের মুহূর্তে ইডেনে
বিষেন সিং বেদী।

করা দরকার। বাঙলার সুব্রত গুহ কি বোম্বাই-এর ইসমাইল —এদের মত অন্ততঃ একজন বোলারও রাখতে হবে আমাদের দলে। আরও একটা ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। ভারতে ওপনিং ব্যাটসম্যানের অভাব দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ভারতের ব্যাটধারীরা উজ্জ্বল ক্রিকেট খেলা থেকেও ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন। রান তোলার গতি এত মন্থর হলে পাঁচ দিনের টেস্টে হারজিতের আশা করা কঠিন। ব্যাটিং-এর দক্ষতা বলতে শুধু যে দীর্ঘকাল উইকেটে টিঁকে থাকা বোঝায় না, হাত খুলে ব্যাট চালানোও তার মধ্যে পড়ে, সে কথা আমাদের খেলোয়াড়েরা ভুলতে বসেছেন। তাঁদের সেটা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই। আর সব শেষে



ফারুক ইঞ্জিনিয়ার
উইকেট কিপিং আজ বিশ্ব সেরা

* বোম্বাই-এর খেলা যথারীতি ড্র হয়েছে। সোলকার রেকর্ড করতে পারেনি। তবে চন্দ্রশেখর এলান নটকে দ্বিতীয় ইনিংসে বোল্ড আউট করে ভিন্নু মানকড় ও সুভাষ গুপ্তের একটি সিরিজে ৩৪টি উইকেট দখলের রেকর্ড ভেঙে দিতে পেরেছে।—লেখক



সুবীর ঘোষ—শান্তিনিকেতন॥ আজ দুপুরে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি এশিয়া পাবলিশিং-এ এসে রোশনাই-এর জন্যে বার্ষিক চাঁদা (৮) দিয়ে গেলাম। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় খুবই খারাপ লাগছে। যা হোক, ভবিষ্যতে এলে দেখা করব।

তুমি এলে এত দূর অথচ দেখা হ'ল না—শোনার পর থেকে ভীষণ খারাপ লাগছে। তুমি তো ভাই সরাসরি আমার বাড়িতেই চলে আসতে পারতে। আবার কবে আসছ কলকাতায়! তখন কিন্তু দেখা করা চাই-ই। পত্রিকা দপ্তরে বিকেল ৫-৭ টা এই দু'ঘন্টা বসি। তবে শরীরটা এখনও ঠিক আগের মত সুস্থই হয়ে ওঠেনি—তাই হয়তোবা রোজ রোজ গিয়ে পৌঁছাতে পারি না। তোমার লেখা তো বেশ কয়েকটি ছাপা হয়ে গিয়েছে—রোশনাই-এর বিভিন্ন সংখ্যায় সেগুলি তো দেখেও ফেলেছ—আশা করি।

কৃষ্ণদাস মণ্ডল—কালনা নদীয়া॥ আমি একজন রোশনাই পত্রিকার গ্রাহক। আমি গ্রাহক হওয়ার পর একটি মাত্র সংখ্যা পাইয়াছি তাহা পূজোর। আপনি যদি এই ব্যবস্থা করিয়া দেন যাহাতে আমি পত্রিকাগুলি ঠিক সময় পাই তাহলে আমি বাধিত হইব।

কি ভাই পুজো সংখ্যা কেমন লাগল কই সে কথা তো বললে না। তোমার চিঠিখানা সার্কুলেশনে পাঠিয়েছি। আশা করি এতদিনে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের রোশনাই অবশ্যই পেয়ে গেছো। আর এতদিনেও না পেয়ে থাকলে জানাবে আবার—নতুন করে পাঠিয়ে দেবো।

এ সোভান—প্রধান শিক্ষক কাজি পাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়—নদীয়া। আমার নমস্কার নেবেন। আমরা নিয়মিত রোশনাই পাচ্ছি না। রোশনাই খুব সুন্দর হয়েছে। তবে ছোটদের জন্যে ছবিসহ আসনের একটি বিভাগ থাকলে আমার মনে হয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে। আশা করি রোশনাই শিক্ষক সমাজ সাদরে গ্রহণ করবেন।

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আরও আপনার সুচিন্তিত মতামতের জন্য। দেখছি আসনের ব্যাপারে কতটা কি করে উঠতে পারি। তবে, শিশুদের কাছে আসনের আবেদন কতটা ফলপ্রসূ হবে ভাববার বিষয়। একে বিদ্যুতের বিভ্রাট—তারপর ছাপাখানা স্টাইক এই দুই-এ আমরা বেশ কিছুটা নাজেহাল হয়ে পড়েছি সে কারণে অনেক কিছুই প্রোগ্রাম মত করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও নির্ধারিত সময়ে রোশনাই পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থাকব। আশা করি নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের রোশনাই পেয়েছেন। মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে পত্রিকা বিষয়ক মতামত জানাবেন। নমস্কার জানবেন।

পূর্ণেন্দুবিকাশ দত্ত—কাছাড়॥ অনেক দিন পর আবার আপনার নিকট পত্র লিখছি। আমি গত পূজা সংখ্যার পর হতে আর কোন রোশনাই পাইনি। তাই আমি রোশনাই পাঠে বঞ্চিত। আমি রোজই পোস্ট অফিসে খবর নিই কিন্তু পর মুহূর্তে ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে ফিরে আমি।…বাকী সংখ্যাগুলি রেজিস্টারী ডাকে পাঠাবার জন্য এক টাকার একটি ডাক টিকিট দিয়ে দিলাম।

বুঝতে পারছি তুমি আমার থেকেও বেশী ভালবেসে ফেলেছ তোমাদের রোশনাইকে। রোশনাই তোমার এত প্রিয় জেনে ভীষণ আনন্দ পেলাম। কি ভাই এখনও কি তুমি নভেম্বর ডিসেম্বরের রোশনাই পাওনি? তোমার পাঠান ডাকটিকেট পেলাম। যদি না পেয়ে থাক আর একবার জানাবে, তাহলেই রেজেস্ট্রী করে যে যে সংখ্যা পাওনি পাঠিয়ে দেবো।

ROSHNAI : POUS 1379 : R. N. 18432/70 Re. 0'80 Regd. No. C-378



Cover Printed by Satya-Sadhana Chhapakhana, 33B. Amherst Street, Cal-9 Phone : 35-4082